নানা রঙের দিনগুলি : শত্রুঘ্ন সিন্‌হা

প্রাপ্ত বয়স্ক চিহ্নিত নাটক কি অশ্লীল ?

সলিম-বিনোদ

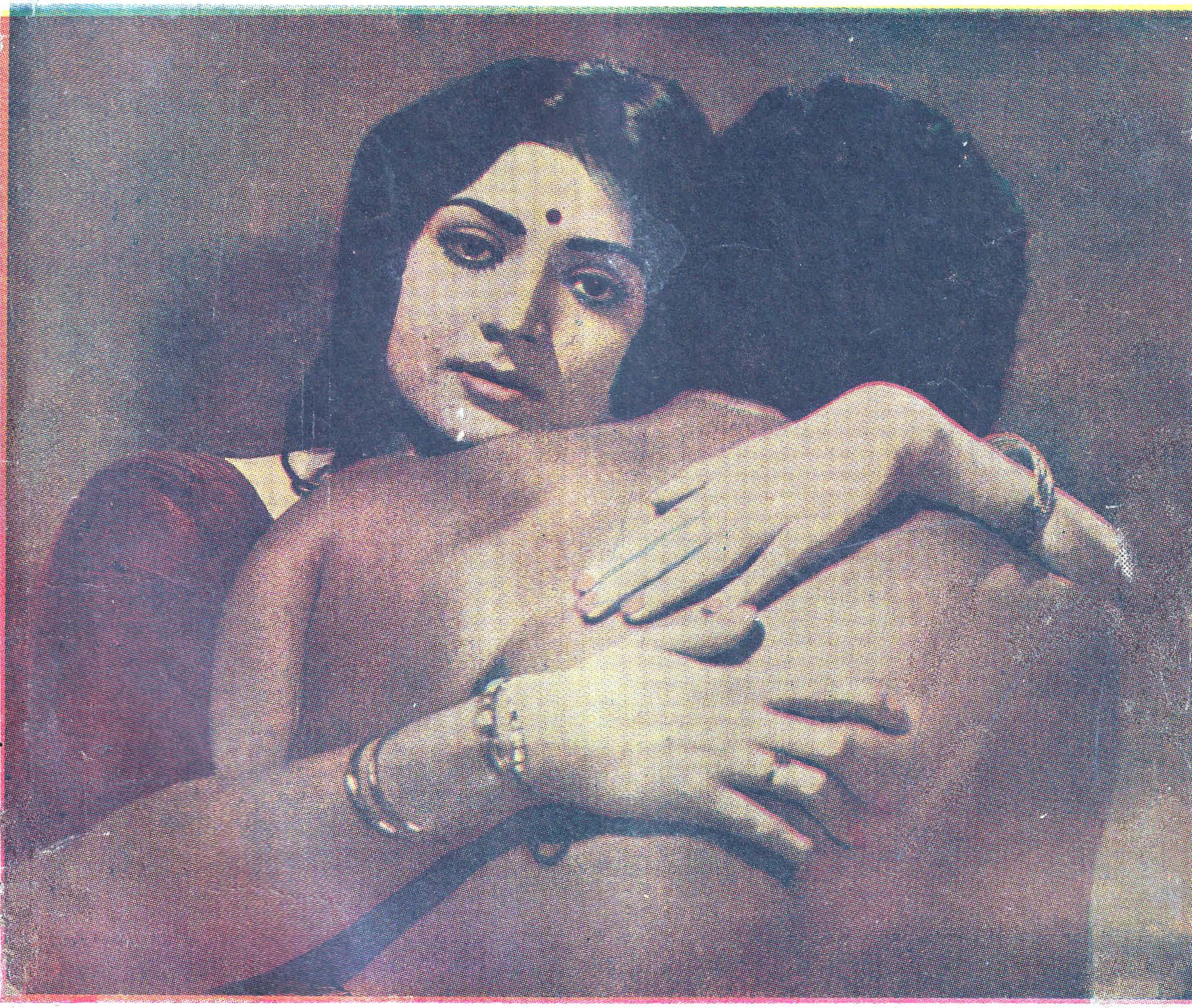
বিন্দিয়া গোস্বামীর ডবল ব্যারেল প্রেম

রম্য সাংবাদিকতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী

ঘরোয়া

অষ্টাদশ বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা

শুক্রবার : ১৬ নভেম্বর ১৯৭৯



একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস : অলীকরেখা

সিতা প্যাটেল প্রেমে পড়েছে !



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

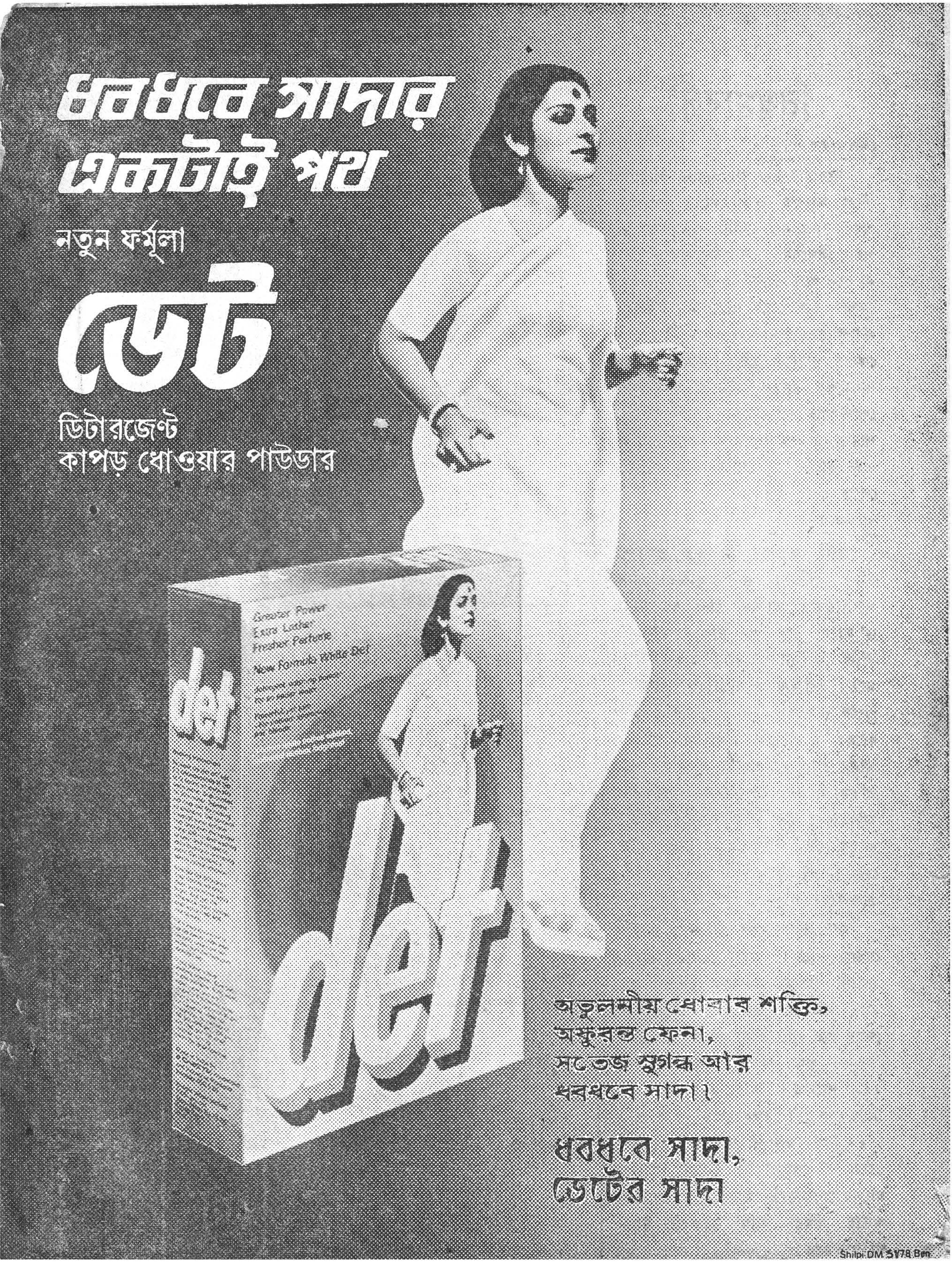
স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


ধবধবে সাদার
একটাই পথ
নতুন ফর্মূলা
ডেট
ডিটারজেণ্ট
কাপড় ধোওয়ার পাউডার
Greater Power
Extra Lather
Fresher Perfume
New Formula White Det
det
det
অতুলনীয় ধোবার শক্তি,
অফুরন্ত ফেনা,
সতেজ সুগন্ধ আর
ধবধবে সাদা।
ধবধবে সাদা,
ডেটের সাদা
Shilpi DM 5178 Ben

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

ঘরোয়ার জন্য যাঁরা লেখা পাঠাবেন তাঁরা অনুগ্রহ করে নিচের কথাগুলো স্মরণ রাখবেন : সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন। পরিষ্কার হরফে লেখা না হলে পড়ে দেখা হয় না। সব সময় লেখার কপি রেখে পাঠাবেন। উপযুক্ত স্ট্যাম্প দেওয়া থাকলে অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয়। মনোনীত লেখা প্রকাশের তারিখ জানতে হলে সঙ্গে পোস্টকার্ড দিয়ে দেবেন।

পাঠকদের আমরা গ্রাহক করতে চাই না, এই কারণে যে পোস্টে বই পাঠালে পেতে দেরি হয়।

গ্রাহকদের প্রতি

প্রতি শুক্রবার নিয়মিত প্রকাশিত হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক চাঁদা ৭৫ টাকা, ছ' মাসের চাঁদা ৩৮ টাকা (সডাক), প্রতি সংখ্যার দাম ১·৫০ টাকা মাত্র। বার্ষিক ও ষান্মাষিক গ্রাহকেরা পুজো সংখ্যা বা অন্যান্য বেশি দামের সংখ্যাগুলি বিনামূল্যে পাবেন। স্থানীয় গ্রাহকেরা শহরের বুকস্টল থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করে নেবেন। আপনারা, আপনাদের যে রোজ সকালে খবরের কাগজ দেয় তাকে বলুন, সেই পৌঁছে দেবে নির্দিষ্ট সময়ে।

এজেন্টদের প্রতি

সারা ভারতবর্ষেই প্রায় সর্বত্র এজেন্সি দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য যেখানে একজন এজেন্ট রয়েছেন সেখানে দেওয়া হবে না। সাধারণ ডাকে বা রেলে বই পেতে হলে প্রতি কপির জন্যে ১·৫০ টাকা হিসেবে জমা রাখতে হবে। কমিশন ২৫·/· পার্সেন্ট। যারা ভি-পিতে পত্রিকা নিতে আগ্রহী তাদেরকেও কপি প্রতি ১·৫০ টাকা জমা পাঠাতে হবে। যারা রেলে বা পোস্টে বই নেবেন, তাঁদের মাসের গোড়াতেই মনিঅর্ডার, পোস্টাল অর্ডার অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে টাকা পাঠাতে হবে।



ঘরোয়া

অষ্টাদশ বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা

১৬ নভেম্বর : ১৯৭৯

সূচীপত্র

ভ্রম সংশোধন :

ঘড়িঘরে একা—দেবকুমার ঘোষ হবে। গত সংখ্যায় দেবপ্রসাদ ঘোষ ছাপা হয়েছিল : দুঃখিত।

সম্পাদকীয়

ভারতবর্ষ আজ চরম দুর্দিনের সম্মুখীন। সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থ নিয়ে কোন্দল এক সাংঘাতিক রূপ নিয়েছে। সাম্প্রতিক আসামে বিদেশী খেদাও আন্দোলন ও বিদেশী মানে বিশেষ করে বাঙালীদের ওপর যে অত্যাচার চলছে তা সত্যিই বেদনাদায়ক এবং লজ্জাকরও বটে। জনতা সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই দেশে এক অরাজকতার যুগ সৃষ্টি হয়েছে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য দিনের পর দিন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সাধারণ মানুষ সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন। কেরোসিন নেই, ডিজেল নেই, বিদ্যুৎ নেই। শুধু নেই আর নেই তবে আছেটা কি? ছাত্ররা লেখাপড়া করবে—কাগজ নেই, বই নেই, তবে তাদের লেখাপড়া শিকেয়? সম্প্রতি ক্ষুদ্র সংবাদ পত্রগুলির অবস্থাও সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে, নিউজপ্রিণ্টের ঘাটতি এবং টন প্রতি পাঁচশ টাকা মূল্য বৃদ্ধি। অতএব দেশের সরকার কোন সমস্যাই যদি সমাধান করতে না পারেন, তবে এর ফলশ্রুতি কি দাঁড়াবে? তার পরেও সমস্ত রাজ্যেই আইন শৃঙ্খলার অবনতি চরম পর্যায়ে, ছিনতাই, ডাকাতি, লুঠতরাজ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কোথায়ও কোন সুরাহা নেই। তাহলে যে সরকার সাধারণ জনজীবনের সিকিউরিটি রক্ষায় পদে পদে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবে তাদের গদি আঁকড়ে থাকার কী অর্থ? পশ্চিমবঙ্গের কথা ভাবুন, গত বছর বন্যার সাংঘাতিক কবলে পড়ে মানুষের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এবারও কয়েকটি জেলায় খরার ফলে মানুষ দিশেহারা, যারা ছোটখাট শিল্প বানিজ্য নিয়ে রয়েছেন, তাদের লোড-সেডিংর জন্য ব্যবসা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। অতএব এই চরম মুহূর্তে এখন যদি সরকার ও দেশের রাজনৈতিক দলগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে এই চরম অবস্থার প্রতিকারের কথা না চিন্তা করেন—তবে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে মাতামাতি করে লাভ কি?

সম্পাদক : বীরেন সিমলাই

বীরেন সিমলাই কর্তৃক অশোক প্রেস, ১৫ ডিকসন লেন, কলিকাতা-১৪
থেকে মুদ্রিত ও ৭৯/৫ বি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড,

........নানা রঙের দিনগুলি

শত্রুঘ্ন সিনহা

পাটনার রাজস্থানী হোটেল ছিল আমাদের আড্ডা। বন্ধুবান্ধবেরা সবাই এসে এখানে জড়ো হতো। তারপর শুরু হতো আমাদের বড় বড় কথা আর চা ধ্বংস-পর্ব। সেদিন সবার আগেই আমি এসে গেছি। অন্য বন্ধুরা তখনও কেউ কেউ এসে পৌছয়নি। একটা চেয়ার টেনে বসে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। চায়ে চুমুক দিয়ে ভাবছিলাম অন্য ভায়েরা কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে গেলো। আর আমার পড়াশোনায় একদম মন নেই। কেবল নাটক নাটক করে ঘুরে বেড়াই। মনে মনে দারুণ উচ্চাশা, একদিন আমি সিনেমার হিরো হবই। কিন্তু আমি তখন ভীষণ বোকা ছিলাম সুযোগ কি করে পাব, সে কথাটা কিন্তু একটি বারও ভাবছি না। সবার ছোট বলে দাদারা আমায় কিছু বলেন না, আর মায়ের কথা ছেড়ে দিন, তিনি আমায় দারুণ স্নেহ করতেন। আর বাবা, জিগ্যেস করবেন না, পড়াশোনা ঠিক মত করতাম না বলে তিনি ছিলেন আমার ওপর অগ্নি-শর্মা। তখন আমার ঠাকুমা বেঁচে ছিলেন। কেবল ঠাকুমার ভয়েই বাবা আমায় কিছু বলতে পারতেন না। এই সব কথা ভাবছিলাম, হঠাৎ আমার সেই চিন্তায় ছেদ পড়ল।

হ্যালো শত্রুঘন, সামনে তাকিয়ে দেখি আমার এক বাল্য বন্ধু।

কিরে, তোর আজ এত দেরী, আমি জিগ্যেস করলাম।

আরে একটা দারুণ খবর আছে? বলেই সে হাতের খবরের কাগজ দেখাল।

কিসের খবর? আমি আগ্রহান্বিত হলাম।

আগে চায়ের অর্ডার দে বেটা।

আমি বেয়ারাকে এক কাপ চা দিতে বললাম।

সে সেই দিনের সার্চলাইট পত্রিকাটা খুলে আমার সামনে ধরল। তারপর বলল এবার এটা পড়ে দেখ, তুই তো ভাল অভিনয় করতে পারিস, ক্যারিকেচারেও এই পাটনায় তোর জুড়ি নেই। চান্স যখন একটা এসেছে, নে এবার একেবারে হিরো হয়ে যা।

হিরো? বলিস কি রে, আমি খবরের কাগজের দিকে না তাকিয়েই উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলাম। হোটেলের লোকেরা আমার দিকে অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল। সেদিকেও কিন্তু আমার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

আরে আগে পড়েই দেখনা। চান্স পেয়েও যেতে পারিস। বন্ধুটি এবার বেশ সিরিয়স হয়ে বলল।

দূর আমি অমন অনেক বিজ্ঞাপন দেখেছি। চারশ বিশ। এ হচ্ছে টাকা খেচার ধান্দা বুঝলি। বড় লোকের ঘরের ছেলে এদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে আসে।

আরে না না, তুই পড়েই দেখনা একবার। আমার সেই বন্ধুটি তখন মরীয়া হয়ে সেই বিজ্ঞাপনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল।

পুণা ফিল্ম ইনিষ্টিটিউটের বিজ্ঞাপন। আমি এক নিঃশ্বাসেই তখন বিজ্ঞাপনটা পড়ে ফেললাম। সত্যিই তো একটা চান্স নেওয়া যেতে পারে। বন্ধুটিকে থাঙ্কস জানালাম।

বাড়ি ফিরে এসেই আর কাল বিলম্ব না করেই প্রসপেক্টাস ও আবেদন পত্রের জন্য চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। দিন কয়েকের মধ্যেই আবেদন পত্রের ফর্ম ও প্রসপেকটাস এসে পৌছল। আমি ভাল করে পড়ে ফেললাম প্রসপেকটাসটা। শেষে আমি মনস্থির করলাম, তারপর মায়ের কাছে গেলাম। তিনি সেকেলে মানুষ, ফিল্মের ব্যাপার অতশত বোঝেন না। তাঁকে বোঝানও একটা দারুণ টাস্ক। তবে একটা কথা আমি জানতাম, মা আমার অবদার কখনও ফেলবেন না। মাকে আমার বাসনা জানাতে তিনি যা বলেছিলেন তা আজও আমার মনে আছে। তুমি যা ভাল বোঝ করো। কিন্তু মনে রেখো; এমন কাজ কখনও করোনা যাতে তোমার বাপ-দাদাদের সম্মানের হানি হয়। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি, কিন্তু তুমি আগে ভাল করে ভেবে দেখ। তোমার অন্য তিন ভাইদের কথা চিন্তা করে দেখ।

তুমি কিছু ভেবো না মা। সেদিকে আমি ঠিক আছি। তোমার ছেলে হয়ে বংশমর্যাদা আমি নষ্ট হতে দেবো না মা। আমি বলেছিলাম।

মা শেষ পর্যন্ত মত দিলেন।

দাদাদের কাছে একে একে গেলাম। কেউ বললে, ওয়েল তুমি যদি এ লাইন পছন্দ করো, তবে আমি বাধা দেব না।

বড়দা একটু ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত

(শেষাংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়)



অলীক রেখা

যুগল সেন

বেশ কিছুদিন হল আমি শান্তিতে ঘুমোই না। ঘুমোতে পারি না। ঘুম আসে না। প্রত্যেকদিন যখন চোখ বুজি, ভাবি একঘুমে আমার সকাল হয়ে যাবে। বস্তুত, মাঝরাতে টুক করে ঘুম ভেঙে যায়। আমার ঘরে ভেন্টিলেটারে মাকড়সার জাল। যখন ঘুম ভেঙে যায়—অন্ধকারেও আমি ভেন্টিলেটারে মাকড়শার জাল দেখতে পাই। রোজ ভাবি মাকড়শার জাল ভেঙে দেব; রোজ ভাবি। কিন্তু ভাঙি না, মনে থাকে না। আসলে মনেই থাকে না। না, আসলে তাও না। মনে থাকে। সারাদিনের কোন সময়ে না। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙার পরই মনে পড়ে—মাকড়শার জালটা ভেঙে দিতে হবে। ভেনটিলেটার দিয়ে ঘরে সকালের আলো আসে না। সকালে আমার ঘুম ভাঙে না। মাঝরাতে ঘুম ভাঙার পর, বিছানায় চুপ করে বসে থাকি। কোন দিন চোখ বুজে শুয়ে থাকি। ভাবি কখন সকাল হবে? মাকড়শার জালটা ভাঙা দরকার। কিভাবে ভাঙব? লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ভাঙব? আমার ঘরে অত বড় লাঠি নেই। তা হলে? এই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একসময় মনে হয়—আরে সকাল হচ্ছে না! ভেনটিলেটারে কুয়াশার মত আলো দেখা যাচ্ছে না! না, মাকড়শার জালটা বিন্দুমাত্র ভাঙার কথা তখন মনে হয় না। মাকড়শাটাকে আমার বড় আপন মনে হয়। পুরোনো দিনের বন্ধুর মত মনে হয়।

একদিন স্বপ্ন দেখলাম মাকড়শাটা আমার মুখের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার সারা মুখে জাল তৈরী করছে। আমার মুখটা মাকড়শার বাসা হয়ে যাচ্ছে। ঘুম ভেঙে গেল। কেন যেন আমার খুব ভয় পেয়ে গেল। পরদিন মাকড়শার জালটা ভেঙেছিলাম।

কয়েকদিন আমার মন খুব খারাপ হয়ে থাকল। কিছু করার নেই। তবু মাকড়শার জন্যে আমার খুব দুঃখ হতে লাগল; অনুশোচনা হতে লাগল। আমি যেভাবে মাকড়শার ঘর ভেঙেছি, সেই ভাবে যদি কেউ আমার বিছানা, টেবিল, জলের কুঁজো ভেঙে দিয়ে যায়?

আহা, রেখার কথা মনে পড়ে গেল। কেন মনে পড়ে গেল রেখার কথা আমার? রেখা এখন কোথায় আমি জানি না। কতদিন ওকে দেখি নি। রেখার জন্যে আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। কষ্টটা বেশীক্ষণ থাকল না। রেখা কেন আমার সঙ্গে দেখা করে না? রেখা কি রাগ করেছে? অভিমান করেছে? রেখার জন্যে আমি একটা নীল শাড়ি কিনে রেখেছি। রেখা নীল রঙ খুব পছন্দ করে।

বললাম—রেখা, ইস, এত দেরী করলে যে? তোমার জন্যে কি রেখেছি বল?

রেখা বলল—কি?

তুমি বল।

রেখা চিন্তা করে। কপালে হালকা চুল ওড়ে। রেখার ঠোঁটে মৃদু হাসি কেঁপে গেল একবার।

মনে করতে পারছি না।

মনে না করেই বল?

রেখা হেসে ফেলল।

বললাম—তোমার জন্যে একটা নীল শাড়ি এনেছি।

সত্যি?

মিথ্যে নয়।

কখন আনলে?

বিকেলে।

এতক্ষণ বলনি কেন?

সবকিছু তাড়াতাড়ি বলতে নেই।

সত্যি, নীল আমার কেন এত ভালো লাগে জানি না।

বললাম—আমার সাদা পছন্দ।

জানো অলীক, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমায় যদি সম্পূর্ণ নীল দেখতে হত। খুশীতে আমি হয়ত মরে যেতাম।

আমার সামনে মরার কথা বলবে না।

কি করব বল? খুব সুখের সময় আমার মরার কথা মনে এসে যায়।

নাও, শাড়ি পরে নাও।

সুখে রেখার গলা ভারী হয়ে গেল। বলল—এখন কোথায় যাবো?

চল বেরিয়ে পড়ি তো।

চল।

রেখা শাড়ি পরার পর তার শরীর নীল হয়ে গেল। নীল রঙ শরীর হয়ে গেল। রেখার হাত পা চোখ হাসি এমন কি সাদা দাঁত পর্যন্ত নীল হয়ে গেল।

রাস্তার সমস্ত লোক আমাদের দেখতে লাগল। যেন খুব একটা আশ্চর্য জিনিস দেখছে। রেখার কোনদিকে খেয়াল নেই। আমরা অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটলাম।

আমরা সুখে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আমরা একটা ছোট পার্কে গিয়ে বসে পড়লাম। আমি মুগ্ধ চোখে রেখার দিকে তাকিয়ে আছি। রেখার কালো চুলের অন্ধকারে অজস্র জোনাকি এসে ভীড় করল। রেখার গোটা মাথাটা সবুজ আলোয় দপ দপ করতে লাগল।

রেখা প্রথমে চোখ বুজল। তারপর চোখ খুলে বলল—তুমি আমাকে নীল শাড়ি দিলে! এর আগে কেউ আমাকে কিছু দেয় নি।

বললাম—তোমার মত কেউ আমার সামনে বসে থাকে নি।

আমরা তিন বোন। আমিই সব থেকে ছোট। ছোটরা তো খুব আদরের হয়। আমি আদরে বড় হই নি।

আমিও খুব অবহেলায় মানুষ হয়েছি।

রেখা সামান্য মুখ নীচু করে খুব আস্তে করে বলল—তুমি কত সুন্দর।

তোমার থেকেও?

হ্যাঁ।

মিথ্যে কথা বলছ কেন?

বিশ্বাস কর, আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না।

তুমি আমার কথা ভাবো?

বুঝতে পার না? তোমার মত আমাকে কেউ কোনদিন ভাবে নি।

আমাকেও তাই। আমি খুব একা একা বড় হয়েছি।

আমরা আরো অনেক গল্প করলাম। আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। রেখা আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। আমিও অনেকক্ষণ রেখার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এইভাবে আমাদের আস্তে আস্তে চোখে ঘুম এসে যেতে লাগল। আমরা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়লাম যেন।

এক সময় আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, চারপাশে অনেক রাত। রাস্তায় গাড়ি নেই। লোকজন নেই। ফাঁকা রাস্তা। অন্ধকার রাস্তা। রাস্তার সমস্ত দোকান বন্ধ। এই দিকচিহ্নহীন নির্জন অন্ধকারে আমরা কিভাবে বাড়ি ফিরব? গোটা শহর আদিম গুহার মত পড়ে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

আমরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। সামনে বিরাট একটা রাস্তা দেখলাম। আমরা হাঁটতে লাগলাম। জীবনে এই প্রথম এত নির্জন শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। খুব ভালো লাগছিল আমার। মনে হতে লাগল সমস্ত পৃথিবীটা আমি পকেটে নিয়ে হাঁটছি। আকাশে অজস্র তারা। রেখার সারা মুখে ভয়। আমি হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বললাম রেখা, তুমি ভয় পেও না। লক্ষ্মীটি আমার তুমি ভয় পেও না। আজকের রাতটা ভুলে যেও না। আমাদের মনে থাকবে। এই শহরের ইতিহাসে এই হয়ত প্রথম—আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। তুমি আমার কাছে আছ, আমার কিন্তু ভয় করছে না। তুমি কাছে থাকলে পৃথিবীর কাউকে ভয় করি না। এর আগে আমি কোনদিন কোন মেয়ের সঙ্গে হাঁটি নি। আমি একা একা বহুকাল, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর হেঁটে বেড়িয়েছি। আমার ছাব্বিশটা বছর একা একা কেটে গেছে।

একটা গলির কাছে আমরা চলে এলাম। চারপাশ অন্ধকার। অন্ধকারে দেখলাম, একটা সরু গলি। গলির ভিতর অনেক ছোট ছোট ঘরবাড়ি। প্রত্যেক বাড়ি অন্ধকার। গলির ধারে, বস্তির পাশে একটা কবর। কার কবর? কবরে একটা প্রদীপ জ্বলছে। শহরে কোথাও

আলো জ্বালা নেই। একটা কবরে, অন্ধকারে একটা প্রদীপ জ্বলছে। কবরের ঠিক সোজা আকাশে ঘা-র মত চাঁদ। মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে। প্রদীপটা নিবছে না। আমরা রেখার বাড়ির কাছে চলে এলাম। একটা ঘরের সামনে চলে এলাম। আশ্চর্য, একটা ঘরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে।

রেখা হেসে বলল—ওই তো আমার মা দাওয়ায় বসে আছে। ইস্।

রেখার মুখ থেকে ইস্ শব্দটা আমার কাছে অনুশোচনার মত মনে হল। রেখা কেন ইস্ করল? আরো কোন শব্দ তো করতে পারত! কেন করল না? মানুষ যখন খুব কষ্ট পায়, দুঃখ পায়, তখন সংক্ষেপে 'ইস' করে। আমার বুকের ভিতরটা জ্বলতে লাগল। এই এতক্ষণ সময় রেখা আমার, কাছে ছিল, কই মনে পড়ে নি আমি কোন কষ্টের কথা বলেছি বা কষ্ট দেওয়ার মত ব্যবহার করেছি? এই দয়ালু রাতে মনে পড়ছে না; মনে পড়ছে না।

আমি দুঃখের সময় কোন কথা বলতে পারি না। আমার শরীর অবশ হয়ে যায়। পা খুব ভারী লাগে। আমি অনেক সময় হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে পড়ি। গাড়ি যাওয়া-আসা করে। এক জায়গায় দাঁড়ানো যায় না। আমি এক মিনিট হাঁটি, দু' মিনিট দাঁড়িয়ে পড়ি। যখন আস্তে আস্তে হাঁটি বা দাঁড়িয়ে পড়ি—কেউ জানে না আমার ভিতরটা কি হয়ে যাচ্ছে! মনে পড়ে আমার মা মারা যাওয়ার পর বেশ কয়েকদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারি নি। অফিস যাওয়ার জন্যে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি; কিন্তু রাস্তায় নেবে আমি আর হাঁটতে পারি নি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি রাস্তায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছি। আমার চোখের সামনে শুধু মাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেতাম না। আমায় চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, অন্ধ ভিখারী মনে করে একজন লোক আমার হাতে একটা চকচকে দশ পয়সা গুঁজে দিয়েছিল।

রেখার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সারা মুখে হাসি উঠে এসেছে। দাঁতগুলো জুঁইফুল; চিকচিক করছে। রেখার মা দাওয়ায় বসে আছে। জানলা দিয়ে রেখার ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। আবছা আলো।

যাওয়ার আগে রেখা আমার কাছে, আমার জামার বোতামের কাছে সরে এল। আমার মুখে কী ছিল কে জানে। রেখা আমার মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকল। আমি রেখার মুখের দিকে একপলক তাকালাম, তারপর প্রদীপ দেখলাম, তারপর আকাশে তাকালাম। রেখা আমার জামার বোতাম লাগিয়ে দিল। রেখার জামার বোতাম লাগান। আমার পকেট থেকে অর্ধেক রুমাল বাইরে বেরিয়েছিল। রেখা সম্পূর্ণ রুমালটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিল। রেখার রুমাল নাভিদেশে গোঁজা। রেখার কাঁধে ব্রা-র সাদা ফিতে দেখা যাচ্ছে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

রেখা আবার বলল—যাই, দেরী হয়ে যাচ্ছে। বলে রেখা দাঁড়িয়ে থাকল। রেখা আমার ডানহাত ধরল। রেখার হাতের তালুতে ঘাম।

রেখা বলল—তুমি এখন সোজা বাড়ি চলে যাবে।

বললাম—যাব।

গিয়ে কি করবে?

ঘুমিয়ে পড়ব!

খাবে না?

হ্যাঁ, খাব। তুমি এখন বাড়ি গিয়ে কি করবে?

খাব, ঘুমিয়ে পড়ব!

আজকের দিনটা তোমার মনে থাকবে?

হ্যাঁ। রেখা হাসল।

আমি বাড়ি গিয়ে ঘুমোব না।

ও মা, কেন?

বললাম—তোমার কথা ভাবব।

নতুন করে কী ভাববে?

আমার জীবন পুরোনো হয়ে গেছে রেখা। তুমি আমার কাছে সব সময় নতুনের মত।

আমাকে নিয়ে তোমার ভয় কেন?

আমার সব সময় মনে হয় তুমি আমার কাছে থাকবে না। তোমাকে আমি ধরে রাখতে পারব না।

বোকার মত বোল না। আমারও মনে হয় তোমার সঙ্গে আমার আর কোনদিন দেখা হবে না।

কখন মনে হয়?

রেখা বলল—যাওয়ার সময় মনে হয়।

এখন মনে হচ্ছে?

রেখা কোন কথা না বলে মুখ নীচু করে থাকল। আমিও কোন কথা না পেয়ে মুখ নীচু করে থাকলাম। বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা যায় না। বারান্দায় রেখার মা অন্ধকারে বসে আছে। ঘরে আলো জ্বলছে। আকাশে তারা জ্বলছে।

বললাম—আর কবে দেখা হবে?

রেখা হেসে বলল—কাল।

যদি কাল দেখা না হয়।

কেন হবে না। কেন, তুমি বাড়ি থাকবে না?

হ্যাঁ, থাকব। তবু যদি না—

তাহলে পরশু।

যদি পরশু না হয়?

যাঃ, পরশু ঠিকই দেখা হবে।

ধরো যদি না হয়। তখন কি হবে?

আমার কথায় উত্তর দিতে না পারায় রেখা প্রথমে চুপ করে থাকল। তারপর ছেলেমানুষের মত মাথা নাড়িয়ে সেই কথাই বলল—কেন পরেও দেখা হবে না? পরশুদিন নববর্ষ। সেদিন আমরা সারাদিন ঘুরে বেড়াব। খুব আনন্দ করে বেড়াব। নৌকো চড়ব।

আর কি করবে?

মন যা চায় তাই করব।

আমি কোনদিন নৌকো চড়ি নি। খুব ছেলেবেলায় আমি একবার নৌকো চড়েছিলাম। আমার জন্ম যশোর জেলায়। ছেলেবেলার কথা আমার

কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে যশোর জেলার আলতাপোল গ্রামে আমার জন্ম হয়েছে। আমার যখন বছর দেড়েক বয়স তখন বাবা আমাদের নিয়ে কলকাতায় চলে আসে। তখন আমাদের অবস্থা খুব ভালো ছিল। বাবার পকেটে সব সময় অনেক টাকা থাকত। কলকাতায় বাবা একটা বাড়ি লিজ নিয়েছিল। সেই লিজ-নেওয়া বাড়িতে আমরা বহুকাল থেকেছি। আমার ঠাকুমা দেশে থাকত। ঠাকুমা মা'র উপর খুব অত্যাচার করত। খুব বকত, অনেক সময় মা'কে ধরে মারত। মা দাদুর বড় মেয়ে। মা'র যখন জন্ম হয়—তখন দাদুর অবস্থা খুব ভালো হয়ে ওঠে। মা খুব আদর যত্নে বড় হয়েছে। দাদুর সংসারে মা'কে কোনদিন এক গ্লাস জল ঢেলে খেতে হয় নি। ঠাকুমা মাকে সবসময় গঞ্জনা দিত। মা কিছু বলত না। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত। আমরা দেশ থেকে আসার পর ঠাকুমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যেতে লাগল। দেশ থেকে এক আত্মীয় বাবাকে চিঠি লিখল—ঠাকুমার অবস্থা ভালো না। যে কোনদিন মারা যেতে পারে। অলীকের মাকে দেখার জন্তে বুড়ি সবসময় কাঁদে। সেই চিঠি পেয়ে মাকে নিয়ে আমরা দেশে চলে গেলাম। মনে আছে, খুব গভীর রাতে নৌকো চড়েছিলাম। ঘন অন্ধকার গাছ পালার ভিতর বিরাট একটা চাঁদ উঠেছিল। মনে হচ্ছিল নদীতে চাঁদ উঠেছে। সেই প্রথম নির্জন সুগন্ধি নদীর বুকে অসংখ্য সবুজ জোনাকির আলো দেখেছিলাম। মাঝে মাঝে দেখতে পাই রাত্রিবেলা একটা নৌকো নদীর উপর দিয়ে তির তির করে যাচ্ছে। নদীতে হলুদ চাঁদ, আর সেই চাঁদকে ঘিরে আছে ঝাঁক-ঝাঁক জোনাকির সবুজ দপদপানি আলো। সেবার ঠাকুমা বেঁচে উঠল। আমরা দেশ থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পর শুনলাম, ঠাকুমা মারা গেছে। আমরা যেতে পারি নি। বাবা আড়া হল। অনেকদিন বাবাকে ঠিক চিনতে পারি নি।

বাবা আমার কাছে অচেনা বাইরের লোকের মত হতে লাগল। বাবার কাছ থেকে সব সময় আমি দূরে থাকতাম। লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতাম। বাবাও আমার বিশেষ খোঁজ খবর রাখত না। ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর বাবা কেমন বোবার মত হয়ে গেল। সকালবেলা অফিস যেত, ফিরত সেই সূর্য ডুবে গেলে সন্ধ্যের পর। বাবা বাইরে বেরোন বন্ধ করে দিল। মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা বন্ধ করে দিল। হাসা বন্ধ করে দিল। তাস খেলা বন্ধ করে দিল। আমাদের খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করে দিল। চুল-দাড়ি রাখা আরম্ভ করে দিল। খুব চুপ করে থাকা আরম্ভ করল। ভাত ছেড়ে দুবেলা রুটি খাওয়া আরম্ভ করে দিল। রাতে ঘুমোনোর সময় ছাড়া বাবাকে কখনও দরজা বন্ধ করতে দেখি নি। বাবা রোজ অফিস থেকে এসে ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিত। বাবাকে কোনদিন জানলায় বসে থাকতে দেখি নি। বাবা চুপ করে জানলায় বসা আরম্ভ করল। জানলায় বসে আকাশে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকা আরম্ভ করল। বাবার হাসিখুশী মুখটা ঝোপ-জঙ্গল হয়ে গেল। বাবা ক্রমশঃ আমার কাছে রহস্যময় হয়ে যেতে লাগল। বাবা আমার কাছ থেকে মাইল মাইল দূরে সরে যেতে লাগল। আমিও বাবার কাছ থেকে মাইলের পর মাইল দূরে সরে যেতে লাগলাম। হঠাৎ বাবার মুখোমুখি হয়ে গেলে কেউ কাউকে চিনতে পারতাম না। আমার বয়স তখন ন-দশ। আমি একদিন বাড়ির রকে বসে আছি। আশ্চর্য, একদিন বিকেলবেলা বাবা অফিস থেকে ফিরে বাড়ি ঢোকার-মুখে আমায় দেখে বলল—'তোর নাম কি? আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভয়ে আমার নাম ভুলে গেলাম। বাবা হুঙ্কার দিয়ে বলল—বল তুই কোথাকার ছেলে? তোর বাপের নাম কি?

আমি আতঙ্কে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলাম। বাবাও আমার পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। মা রান্নাঘরে রান্না করছিল। আমি পিছনে লুকিয়ে পড়লাম। মা বলল—কি রে? বাবাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—আমার নাম জিজ্ঞেস করছে। বাবা ততক্ষণে রান্নাঘরের দরজার সামনে চলে এসেছে।

মা বাবাকে বলল—কি ছেলেটাকে তাড়া করছ কেন?

আমি ওর নাম জানতে চাইছি।

তোমার ছেলের নাম জানো না?

বাবা মুহূর্তে কারেন্টের শক খেল যেন। আমার ছেলে, আমার ছেলে!' বিড়বিড় করতে করতে বাবা টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

সেদিন রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। কার যেন গোঙানির স্বর শুনলাম! ঘরে, জানলার বাইরে খুব অন্ধকার। সেই নিরেট অন্ধকারে অল্প অল্প চাঁদের আলো। দেখলাম আমার পাশে মা নেই। মার সাথে আমি ঘুমোই। দেখলাম দরজা খোলা। খাট থেকে নেবে বারান্দায় গেলাম। মাকে দেখছি না। কোথায় গেল মা? দেখলাম বাবার ঘরে আলো জ্বলছে! দেখলাম বাবা শুয়ে আছে। বাবার কোলের কাছে মা বসে আছে। আমি জানলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখলাম বাবা মার হাত ধরে মিনতির মত বলছে—বল।

কি বলব?

বল, তুমি আমাকে একবার খোকা বলে ডাক।

মার গলা কান্নার মত শোনাল। আমি কোন মুখে বলব?

তুমি না বোল না। একবার অন্তত বল।

মা চোখ বন্ধ করল।

বাবা মা'র হাত মুঠোয় চেপে আবার বলল—মা আমাকে খোকা বলে ডাকত।

মা আর কখনো খোকা বলে ডাকবে না। তুমি মার মত একবার খোকা বলে ডাক।

আমি অলীকের মা। তোমার মা কি হতে পারি? একি কথা আমায় বলছ? তুমি একবার আমায় খোকা বলে ডাক। যেমন মা ডাকত—খোকা-রে। সেই ভাবে ডাক! তাহলেই আমি আবার নতুন করে জীবনটা আরম্ভ করতে পারব। আজকের রাতের মত তুমি আমার মা হয়ে যাও। বল—খোকা—খোকা রে—'

বাবা মারা যাওয়ার পর মা একদিন গভীর রাতে স্বপ্নের ভিতর চিৎকার করে উঠেছিল—খোকা-রে—।

মরা নিম ডালে কোকিল ডাকল। কোকিলের ডাক বড় মধুর। বসন্তকালে কোকিল ডাকে। আমি বসন্তকালে কোকিলের ডাক শুনি নি। বসন্তকালে কবে আসে আমি জানি না। কিভাবে আসে জানি না। কোকিল হয়ত বসন্তকাল গলায় নিয়ে আসে। আমি কখনও কোকিল দেখি নি। কাক দেখেছি। অনেক সময় কাককে ভুল করে কোকিল ভেবেছি। অফিসে দুচারজন বন্ধুকে বলেছি আজ কোকিল দেখেছি। কোকিলের গায়ের রং কালো, তাও বলেছি। শুনে বন্ধুরা বলেছে···তুই কোকিল দেখিস নি। শহরে কোকিল থাকে না। শহরে কাক থাকে। দিনরাত কা-কা করে ডাকে। শহরে প্রেম নেই কোকিলও নেই। কাক আছে। কাকরা নর্দমার ধারে, ডাস্টবিনে ঘোরে। আমি কোকিল দেখি নি। কোকিল দেখতে ইচ্ছে করে। কোকিলের ডাক শুনতে ইচ্ছে করে। কোথায় কোকিল ডাকে? কোকিলরা কোথায় থাকে। কখন ডাকে? মাঝে মাঝে আমি নিজের ভিতর নানারকম ডাক শুনতে পাই। নানারকম গলায় অলীক আমাকে ডাকছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

অলীক।

এই যে আমি।

ঝর্ণার ধারে যাবে?

যাব। আমি ঝরণা দেখি নি।

ঝর্ণার জলে স্নান করবে?

করব।

ঝর্ণার ধারে ধূসর একটা পাহাড় আছে। আমি সেই পাহাড়ে বসব। ঝর্ণার শব্দ শুনবো।

তোমায় আমি একদিন ঝর্ণা দেখাতে নিয়ে যাব।

কবে?

একদিন নিয়ে যাব।

না, আমি ঝর্ণা দেখব না। ঝর্ণার শব্দ শুনতে চাই না। ঝর্ণা দেখে কি হবে? ঝর্ণার শব্দ শুনে কি হবে? আমি কিছু দেখতে চাই না। আমি একটু ঘুমোতে চাই। ইস, কেন মাকড়শার বাসা ভাঙলাম? যখন মাকড়শার জাল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভাঙি, তখন হয়ত মাকড়শাটা ঘুমোচ্ছিল। শান্তিতে ঘুমোচ্ছিল। আমি যদি রেখাকে নিয়ে ঘুমোই—তখন যদি কেউ আমাদের খুচিয়ে খুচিয়ে মারে? না, রেখাকে আমার নিরাপদে রাখার দরকার। রেখা ছাড়া আমার এখন কেউ নেই। রেখা ছাড়া আমি আর কাউকে ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না। রেখাকে ছাড়া আমি আর কাউকে চাই না। না, না। হঠাৎ মনে হল রেখাকে এখনও ঠিক ভালোবাসতে পারি নি। আপন করে নিতে পারি নি। রেখাকে নিয়ে আমার সব সময় ভয়। সব সময় ভয়। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় আরম্ভ হয়, যত বেলা বাড়ে ভয় শীতও বাড়তে থাকে। ভয়ে কাঁপতে থাকি ভিতরে। এত ভয়ে ভয়ে থাকি যে দিনে কতবার যে চমকে উঠি জানি না। সেই ভয়কে চাপা দেওয়ার জন্যে অনেক সময় আপন মনে গান গাই। হয়ত এক লাইনই পঞ্চাশবার ধরে গাই। গান গাইতে গাইতে আমি অনেক সামান্য সামান্য কাজ ভুল করে ফেলি। এই ভাবে আমার ভুল কাজ বাড়তে থাকে। সেই ভুল কাজ ঠিক করতে গিয়ে আরো ভুল করে ফেলি। রাশিকৃত ভুল কাজ এক-দলা হিজিবিজির মত আমার চোখের সামনে কেঁচোর মত নড়াচড়া করে। তখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। গলা শুকিয়ে যায়। চোখ ভারি হয়ে যায়। সামনের সবকিছু ধোয়া হয়ে যায়।

এই ভাবে আমার চোখ যদি ঝাপসা হয়ে যায়, তখন আমার কি হবে? আমি কোন কিছু চিনতে পারব না। দেখতে পাব না। এই ভুবনে কত আশ্চর্য রকম মনোরম জিনিস আছে দৃশ্য আছে। আমি যেসব জিনিস থেকে ক্রমশ বঞ্চিত হয়ে যাব। অন্ধের মত ঘরে বসে থাকব? অন্ধরা কিছু দেখতে পায় না। রেখার জীবনের অনেককিছু আমি এখনও চিনি নি। দেখি নি। রেখা গোপনে আমার সম্পর্কে কি ভাবে আমি জানি না। রেখাকে আমি ভাল-বাসতে পারি না। রেখার সঙ্গে আমি ভালো করে কথা বলতে পারি না। তার মানে রেখা আমার কাছে এখনও কুয়াশা। রেখাকে এখনও আমি মনের মত করে চিনতে পারি নি। রেখার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারি না। তারমানে রেখার অনেক-কিছু দেখা এখনও আমার বাকি আছে। রেখাকে আমি ভুলে যাব। রেখা যদি বলে—আমার দু'বছর দেড়মাস ফিরিয়ে দাও। আমি তা কখনও দিতে পারব না।

আমার টেবিলে ঘড়ি। ঘড়ির টিকটিক শব্দ হচ্ছে। ওঃ, ঘড়ির শব্দ হবে কেন? ঘড়িটা বেশ কিছুদিন বন্ধ হয়ে আছে। ঘড়ি এখন চলে না। বন্ধ হয়ে আছে। আর কতদিন বন্ধ থাকবে জানি না। ঘড়িটা কবে দোকানে নিয়ে যাব জানি না। ঘড়িটা নিয়ে যাওয়ার কথা মনে থাকে না কেন? ভুলে যাই কেন? আমার শুতে দেরী হয়। ঘুমোতে দেরী হয়। উঠতে দেরী হয়। বেরোতে দেরী হয়। বাস ধরতে দেরী হয়।

নাবতে দেরী হয়। অফিস যেতে দেরী হয়। মনের মত, সময় মত কাজ করতে দেরী হয়। মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় উত্তর দিতে দেরী হয়ে যায়। আমার জীবনটা স্বাভাবিক ভাবে অনেক দেরীতে আরম্ভ হয়েছে। তাই আমার সবকিছুতেই দেরী হয়ে যায়। আমার শিকড় পৃথিবীর মাটিতে ঢুকতে অনেক দেরী করেছে। রেখা আমার মাথায় ঘড়ি হয়ে বসে টিক টিক টিক শব্দ করে যাচ্ছে...

আমি সামান্য একটা চাকরি করি। আরো সামান্য আমার বসবার ঘর। জানলার ধারে আমার চেয়ার। চেয়ারটা বহু পুরোনো। আমার চেয়ারে আমার আগে কম করে কুড়ি-বাইশজন বসে কাজ করেছে। মাথার উপর আদ্দি-কালের পুরোনো একটা পাখা আছে। প্রায়দিনই পাখাটা বন্ধ থাকে। চলে না। জানলা দিয়ে হাওয়া আসে। রোজ এক ঘেয়েমি কাজ করতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে সব ফাইল জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে চলে যাই। কিন্তু যেতে পারি না। পাখা চলে না। ইচ্ছে করে পাখা ভেঙে দিয়ে চলে যাই। যেতে পারি না। আমার পিছনের চেয়ারে রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট বিরাট চুলদাড়িওয়ালা লোকটা পঁচিশ বছর ধরে একটা কথাই বলে আসছে—কিছুই ভালো লাগে না। আমার রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট বিরাট চুলদাড়িওলা লোকটা মানে, হরিদাসবাবুর সঙ্গে কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না। লোকটা সেই সকালে চেয়ারে শকুনের মত বসেন, ওঠেন ঠিক পাঁচটায়। এতক্ষণ সময় লোকটা চেয়ার থেকে এক মিনিটের জন্যেও ওঠেন না। কথাও বলেন না। লোকটার মাথা সব সময় কাঁপে। যেন মনে হয়, খুব দ্রুত গতিকে না না করে যাচ্ছেন। লোকটার দাঁত নেই, অথচ মিনিটে মিনিটে পান খান। আর অবিরত মুখ থেকে খচ-খচ শব্দ করে যান। লোকটাকে দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কেউ বলে —কেমন আছেন? হরিদাসবাবু এমন ভাবভঙ্গি মুখ করে তাকাবেন, মনে হবে কোথাও মহামারি বা অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে।

জানলা দিয়ে প্রায়ই আমার টেবিলে এক টুকরো রোদ আসে। আমি কাজ বন্ধ করে টেবিলে রোদের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার কাজ করতে ইচ্ছে করে না। আমি চোখ বুজে চুপ করে থাকি। টুকরো রোদের দিকে তাকিয়ে আমার ছেলেবেলার কথা কেন যেন মনে পড়ে যায়। মার কথা কেন যেন মনে পড়ে যায়। বাবার কথা কেন যেন মনে পড়ে যায়। কেন মনে পড়ে যায়? আমার সবকিছুতে কেন ভুল হয়ে যায়? আমার মন চক্রের মত মাথার ভিতর ঘুরতে থাকে। রেখার কথা কেন মনে পড়ে যায়? কেউ কি আমার নাম ধরে ডাকল—অলীক—

না, আমার জানলার পাশ দিয়ে একটা চড়াই পাখী ডাকতে উড়ে চলে গেল। একা। চড়াইরা কখনও একা একা থাকে না। সব সময় ওরা দুজনে ডাকাডাকি করে উড়ে বেড়ায়, খেলা করে বেড়ায়। পাখীরা কখনও একা একা থাকে না। ওদের সুন্দর ডানা আছে। আমাদের ডানা নেই। কিন্তু ডানার থেকে অনেক বড় জিনিস আমাদের আছে। আমাদের অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারি না। কেন পারি না? আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না।

আমি যখন কাজ করি তখন মনে হয়—এ কাজ আমার নয়। যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটি তখন মনে হয়—এ রাস্তা দিয়ে আমার হাঁটার কথা নয়। রাস্তার লক্ষ লক্ষ বিচিত্র মানুষের মুখের দিকে যখন তাকিয়ে থাকি তখন মনে হয়—এ মানুষ আমি চিনতে পারছি না। যখন বাড়ি ঢুকি তখন মনে হয়—এ আমি কোথায় এলাম! যখন একা থাকি তখন মনে হয়, আমি চিরকালের এক কাঙাল। যখন ঘুমোই তখন মনে হয় —আমার ঘুম যেন আর না ভাঙে।

কিন্তু আমি শান্তিতে এক নাগাড়ে সারা-রাত ঘুমোতে পারি না। ঘুম ভেঙে যায়। চোখ বুজে ভাবি—এবার হয়ত ঘুম আসবে। আসে না ঘুম। পাশ ফিরে শুই, ঘুম আসে না। উঠে জল খাই। জল খেয়ে শুই। ঘুম আসে না। পৃথিবীর সবাই ঘুমোচ্ছে। আমার ঘুম নেই। কেন? ঘরে আলো জ্বালাই। ভাবি, হয়ত বিছানায় পিঁপড়ে আছে। পিঁপড়ের কামড়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়। হেরিকেন নিয়ে আমি মশারীর ভিতর ঢুকে পড়ি। পিঁপড়ে খুঁজি। পিঁপড়ে খোঁজা খুব কঠিন। একটাও পিঁপড়ে আমি খুঁজে পাই না। ছারপোকা বা মশাও না! আমি খুব করুণ মুখে বালিশের দিকে তাকিয়ে থাকি। আর শুই না। ভাবি, বসে থাকলে ঘুম আসবে। বসে থাকি। বসে ঘুম আসে না। তবু বসে থাকি। ঘুম আসে না। সকাল হয়ে আসে। হরিদাসবাবু একদিন বলেছিলেন—দূর মশাই, আমার সবসময় এত ঘুম পায় যে আজ পর্যন্ত কোন কাজই ভালোভাবে করতে পারলাম না। ইস আমি কেন হরিদাসবাবু হতে পারলাম না! কিন্তু যখন দেখি হরিদাসবাবুর মাথা থরথর করে কাঁপে, বা গরুর মত অবিরত জাবর কেটে যাচ্ছেন তখন মনে হয় আমি আমার মত থাকব। কেউ কারও মত হতে পারে না।

আমার ঘরের দুটো চাবি। একটা আমার কাছে থাকে, আর একটা রেখার কাছে থাকে। রেখা খুব সতর্ক। রেখার সবকিছু মনে থাকে। সবদিকে তার চোখ থাকে। দুটো চাবি আমি নিজের কাছে রাখতে পারতাম। রাখি নি। রেখাই আমার কাছ থেকে প্রায় ঘরণীর মত জোর করে একটা চাবি নিয়ে নিয়েছে। আমার কাছে একটা থাকুক। দুটো রাখলে দুটোই হারিয়ে ফেলবে। একটা থাকলে হারাবে না।

কথাটা ঠিক। দুটো থাকলে বা দুটোর বেশী থাকলে হারাবেই। কিন্তু একটা থাকলে হারাবে না। কেননা সব সময় মনে হবে আমার একটার বেশী নেই। একটা হারালে আমার আর কিছু থাকবে না। আবার একটা থাকলেও তো হারানোর ভয় কম থাকে না! একটা চাবি আমার কাছে সব সময় থাকে আর হারানোর ভয়ও সব সময় থাকে। রেখা আমার জীবনের চাবি। রেখাকেও আমার সব সময় মনে হয় হারিয়ে যাবে। কিন্তু রেখাকে আমি লোহার চাবির মত সব সময় পকেটে রাখতে পারি না। আহা, ইচ্ছে মত যদি আমি রেখাকে পকেট থেকে বার করে দেখতে পারতাম!

রেখা আমাকে তার একটা ফটো দিতে চেয়েছিল। আমি নিই নি। ফটোর সঙ্গে কেমন কেন মৃত্যুর সামান্য গন্ধ মিশে থাকে। আমি রেখার ফটো নিই নি। আমি নিজের ফটোও তুলি নি। ফটো তুলতে ইচ্ছে করে না। কারও ফটো নিতে ইচ্ছে করে না।

আরে, আমার ঘরের সামনে বারান্দা এল কি করে? আমার ঘরের দরজার সামনে জানলা নেই; জানলা এল কোত্থেকে? পকেট থেকে চাবি বার করে তালা যেই খুলতে গেলাম, ওমা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। রেখা কখন এল? রেখা মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে আমার ঘরে আসে। তার কাছে আমার ঘরের চাবি থাকে। কখন থেকে রেখা তালা খুলে ঘরে বসে আছে? দরজা বন্ধ করে দিয়ে আছে কেন? আমি প্রথমে রেখার নাম ধরে ডাকলাম। না সাড়া নেই। আমার কেন যেন খুব ভয় করে উঠল। রেখা সাড়া দিচ্ছে না কেন? রেখা কথা বলছে না কেন? রেখা বলেছিল—তোমার কাছে যতটুকু সময় থাকি, সেই টুকুই আমার শান্তি। আমি দরজার কড়া জোর করে নাড়াতে লাগলাম। এতক্ষণ পর খটাস্ করে খিল খোলার শব্দ হল। খুলতে খুলতে বলল—আমি তো তোমার কেউ না। মদ নিয়ে রাত কাটাও! ঘরে এলে কোন দুঃখে? দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম রেখার হাতে বিরাট এক ঝাটা। বউটা নিমেষে ঝাটা নামিয়ে বলল—আ মরণ, তুই কে? বলে ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমি রাস্তায় নেবে পড়লাম। নির্জন অন্ধকার রাস্তা। রাস্তায় একটা কুকুর শুয়ে আছে। বাড়িটার রাস্তার সিঁড়ির পাশে নর্দমা। সেই নর্দমায় কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে একটা লোক ঘড়ঘড়ে গলায় সুর করে বলছে—মাইরি আমার রাধারাণী, তোমার হৃদয় দুয়ার খোলো মাগো, হৃদয় দুয়ার খোলো—

রেখা, তুমি কোথায় যাবে? কোথায় যাবে তুমি? তুমি ঠিক ফিরে আসবে। আমার কাছে তোমার ফিরে আসতেই হবে। আমাকে ছাড়া তুমি কোন কাজই করতে পারবে না। তুমি যেখানে যাবে আমি তোমার কাছে থাকবো; যেমন তোমার চোখ তোমার কাছে আছে।

আমি কার সঙ্গে কথা বললাম? আমার পাশে তো কেউ নেই। কেউ নেই? রেখা নেই? নববর্ষের দিন রেখার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। রেখা দেখা হবে বলেছিল। আমিও মনে মনে বলেছিলাম—দেখা হবে। দেখা হয় নি। আমি রেখার জন্যে যেখানে দাঁড়াই, সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেছি। একা একা দাঁড়িয়ে থেকেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছি। রেখা আসে নি। কেন আসে নি? এইভাবে আমি বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ঠায় রেখার জন্যে দাঁড়িয়ে থেকেছি। আমার চোখের উপর দিয়ে নববর্ষ চলে গেছে। এক সময় দেখলাম রংগিলি রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেছে। আমার কাছে একটা কুকুর ছাড়া নববর্ষের আর কেউ থাকে নি।

একটু আগে মিনিট দশেকের জন্যে চুনো বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টির পর সন্ধ্যে নাবল। আকাশে মিহি চাঁদ উঠল। এক এক করে তারা উঠল। আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখলাম। অন্ধকারে বস্তিবাড়ি ডুবে আছে। বস্তি বাড়ি থেকে একটা মরা শিশু নিয়ে কয়েকজন লোক জ্যোৎস্না রাতে গলি পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে উঠল। শিশুটা অপুষ্টিতে মারা গেছে হয়ত। হয়ত কোন জ্বরে বা অসুখে মারা গেছে। কিসে মারা গেল জানি না। কিন্তু শিশুটা যে বেঁচে নেই এটা জানলাম। কেন না শিশুর যুবতী মা গলির কাদায় পড়ে কাঁদছে। আবার কয়েকজন লোক সেই শিশুর মাকে জোর করে কাদা থেকে তুলে নিয়ে গেল। একটা নেড়ি কুকুর ডেকে উঠল। কুকুরটার স্বর অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেল। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল। চাঁদের আলো আরো ঘন হল। তারারা আরো বেশী করে ফুটল। ফুল ফুটলে গন্ধ বেরোয়। মানুষের যৌবন ফুটলে গন্ধ বেরোয়। যার নাম প্রেম। ফোটা চাঁদ তারার কোন গন্ধ নেই। অথচ সুন্দর দেখায়। ঝলমলে তারার আকাশ আমার জানলায় ঝুলে আছে।

রেখা জানলার সামনে চেয়ারে বসে আছে। রেখার চোখ তারার মত জ্বলছে।

আমি বিছানায় বসে অনেকক্ষণ ধরে রেখাকে দেখতে লাগলাম। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না রেখা আমার সামনে বসে আছে।

রেখা বলল—আমি সেই কখন থেকে বসে আছি। তুমি এত দেরী করে অফিস থেকে ফিরলে কেন?

বললাম—কোথাও যাই নি। অথচ কেন যে দেরী হয়ে গেল!

আরেকটু দেরী হলে আমি চলে যেতাম!

কোথায় যেতে?

রেখা রসিকতা করে বলল—তুমি বল।

তুমি কোথাও যেতে পারো না রেখা। কেননা, তুমি জানো আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

শুনে রেখা যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

বলার সময় আমি রেখার মুখের দিকে তাকাই নি। রেখার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না। কিন্তু রেখা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল—আমি বুঝতে পারি। রেখা কেন গম্ভীর হয়ে গেল? রেখা কেন ভারী নিঃশ্বাস ফেলল? রেখার ভারী নিঃশ্বাস যেন আমার শরীরের ভিতর ঢুকে গেল।

রেখা চুপ করে কোলে একটা হাত রেখে বসে আছে। রেখার হাত খুব ফর্সা। রেখা চুপ করে বসে আছে। আমার ঘরের চাল থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। টিকটিকির ডাক শুনে রেখা হেসে ফেলল। আমিও হেসে ফেললাম।

রেখা কি আমার কথা শুনতে পায়নি।

বললাম—রেখা, আমার কথা তুমি শুনতে পাও নি?

রেখা হেসে উত্তর দিল।

তুমি শোনো নি, আমি কি বলেছি।

রেখা হেসে আবার বলল, শুনেছি।

রেখার হাসি দেখে আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল। বললাম, আমি কি বলেছি, বল?

বাব্বা, অত জেরা করছ কেন?

তুমি আমার কথা মন দিয়ে শোন নি। তুমি কি ভাবছ?

কি আবার ভাবব?

সত্যি বল, কি ভাবছিলে? তোমাকে অন্যমনস্ক লাগছে কেন? তোমাকে ক্লান্ত লাগছে কেন? তুমি জোর করে হাসছ কেন?

তুমি এত দেখ কি করে?

তোমাকে আমি দেখতে পাই।

আমার কি দেখলে?

তুমি কি ভাবছিলে?

কিছুই ভাবি নি।

নিশ্চয় কিছু ভাবছিলে।

আমি মিথ্যে করে হাঁ বলব নাকি?

সত্যি বল।

সত্যি বলছি, আমি কিছু ভাবি নি।

ওঃ, তাহলে আমারই ভুল হয়েছে। আমার সব সময় মনে হয়, তুমি সব সময় কি যেন ভাবো। তোমার ভাবনাকে আমি ছুঁতে পারি না।

তুমি অত ভেব না। আমার কষ্ট হয়।

কই আমার নিজের কোন কষ্ট টের পাই না। শহরের দিনরাত চিৎকার আর বিভৎস শব্দ আমার আর ভালো লাগে না রেখা। আমার গোটা মাথাটা হিংস্র শহর গিলে ফেলছে।

রেখা আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল—ওই দেখো।

আশ্চর্য, জানলার ফাঁক টপকে এক-টুকরো চাঁদের মিহি আলো ঘরের দেয়ালে লেগে আছে। ঘর আবছা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চাঁদের মিহি আলো।

রেখার সমস্ত শরীর হাসিতে কেঁপে উঠল। ঝলমল করে উঠল। রেখার মুখ থেকে যেন চাঁদের মিহি আলো বেরোচ্ছে।

রেখা বলল—এই কথা বোল না।

কেন?

ওই আলোটুকু দেখি বলে সত্যি সত্যি রেখা দেয়ালের ফিকে আলোটুকু দেখতে লাগল। এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে রেখা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগল। আবার সেই আগের মত অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগল। আস্তে করে ডাকলাম—রেখা।

রেখা শুনতে পেল না। আমি আর ডাকলাম না। চুপ করে রেখাকে দেখতে লাগলাম।

মানুষের ঘুম যেমন আচমকা ভেঙে যায়, তেমনি রেখা চমকে আমার দিকে চাইল।

প্রায় চিৎকার করে বললাম—রেখা চমকে উঠলে কেন?

রেখা আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমায় চিনতে পারছে না। কোনদিন দেখেও নি। কেমন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। কি হল? রেখা কেন অমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে?

কি হল রেখা?

রেখা বলল—জানো, আমার ছেলেবেলার কথা যেন মনে পড়ে গেল।

কি মনে পড়ে গেল?

তুমি তো জানো, আমাদের দেশে বিরাট মাটির বাড়ি ছিল। জানলার ধারে আমি রোজ ঘুমোতাম। রোজ ঘুমোনোর সময় জানলা দিয়ে দিনের মত চাঁদের আলো আমার সারা শরীরে শিউলি ফুলের মত ছড়িয়ে থাকত সারা রাত। সারা রাত আমি চাঁদের আলোয় ঘুমোতাম। ঘুমিয়ে কি সুখ ছিল। এখন আমাদের ঘরে একটা জানলা আছে, কিন্তু সে জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায় না। জানলার ধারে ফ্যাক্টরির মোটা দেয়াল। নিঃশ্বাস নিতে পারি না। চাঁদের আলো আমাদের ঘরে আসে না—

কি আসে?

ফ্যাকটারির কালো ধোঁয়া।

চল রেখা, আমরা এই হিংস্র শহর আর কালো ধোঁয়া ছেড়ে কোথাও চলে যাই।

রেখা বলল—কোথায় যাবে?

কোথায় যাব জানি না। তবে এখানে নয়, অন্য কোনখানে।

রেখা বলল—আমারও এখানে থাকতে ভালো লাগে না।

রেখা, আমরা কোথায় যাব? আমার তো কোন চেনা জায়গা নেই।

রেখা বিষণ্ণ হেসে বলল—আমারও তো কোন চেনা জায়গা নেই।

হঠাৎ কেন যেন আমরা চুপ করে গেলাম। আমরা যেন সমস্ত কথা হারিয়ে ফেললাম। আমাদের সামনে সমস্ত রাস্তা যেন বন্ধ হয়ে গেল। আমার চোখের সামনে একটা অন্ধকার মরুভূমি জেগে উঠল। আমাদের কেন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

আবার টিকটিকিটা ডেকে উঠল। আমি আমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। জানলা দিয়ে টুকরো কুয়াশা-ঢাকা আকাশ দেখতে পেলাম। ঢাকা কুয়াশায় অনেক অস্পষ্ট তারা তারাদের কোন শব্দ নেই। তারারা অনেক দূরে থাকে। তারার মত আমরা জ্বলতে পারি না। তারারা আমাদের কথা শোনে না। সকাল হলে তারারা থাকবে না। সব নিবে যাবে। কেন আমার তারাদের কথা মনে পড়েছে? কেন মনে পড়ছে। সেই ছেলেবেলা থেকে তারা দেখে আসছি তারারা অনেক দূরে থাকে। তারাদের মত আমি দূরে থাকতে চাই না। দূরে থাকায় শান্তি নেই। কাছে থাকায়ও শান্তি। ঘুমিয়ে শান্তি নেই। খেয়ে শান্তি নেই। ভোগে শান্তি নেই। ধর্মে শান্তি নেই। ত্যাগে শান্তি নেই। ক্ষুধা বলে শান্তি নেই। কিসে শান্ত আছে? কোথায় শান্তি আছে? আমি শান্তি দেখতে চাই। কেমন দেখতে শান্তিকে? ওই আকাশ-ভরা তারার মত আমি কি কোনদিন শান্তি দেখেছি? আমি একটু শান্তি চাই। শান্তিতে ঘুমোতে চাই। আমি মাকড়সার জালটা ভেঙে দিতে চাই নি। সত্যি চাই নি। আমি ঘুমোতে চাই। আমি নতুন করে আবার জীবনটা আরম্ভ করতে চাই। নতুন রাস্তায় হাঁটতে চাই। রেখাকে অনেক দূরে কোথাও নিয়ে যেতে চাই। পারব না? সব কিছু নতুন করে আরম্ভ করতে পারব না? কবে? দিন চলে যায়। হাত নেড়ে দিন চলে যায়। আমি সেই নতুন দিনের হাতকে ছুটে গিয়ে ধরতে পারছি না। ধরে বলতে পারছি না—এই যে আমি এসে গেছি।

মুমূর্ষ মাছের চোখের মত রাস্তার লাইট পোস্টের আলো জ্বলছে। মানুষের কালো মাথার বিরামহীন স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

বিচিত্র গাড়ির শব্দ আর মানুষের কথা এক সঙ্গে মিশে তালগোল পাকিয়ে গেছে। ফুটপাথে লাইটপোস্টের তলে একটা শনি মন্দির। পূজো হচ্ছে হয়ত। অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে। সেই ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে। মা শঙ্খ বাজিয়ে পূজো করত। তখন আমি অবলীলাক্রমে হাত কপালে ঠেকিয়ে ঠাকুর প্রণাম করতাম। এখন হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করতে পারি না। হাত কাঁপে। কেন আমার হাত কেঁপে ওঠে?

আমি কত কিছু সাজাতে চাই। হঠাৎ মনে হল আমার টাকা নেই। আমার যদি অনেক টাকা থাকত—কত কিছু করতে পারতাম। আমার ঘরে রাস্তার ধুলো সবসময় আসে। আমার জানলার পর্দা নেই। একটা ভালো চেয়ার নেই। একটা টেবিল আছে, কিন্তু টেবিল ক্লথ নেই। আমার একটা ভালো জামা নেই। একটা ছেঁড়া চটি বহুদিন ধরে চালাচ্ছি। আমি যা মাইনে পাই—ঘর ভাড়া দিয়ে নিজে রান্না করে খেয়ে হাতে প্রায় কিছুই থাকে না বলা যায়। রাস্তার বারোয়ারি চিৎকার সব সময় আমার ঘরে আসে। ভালো করে কথা বলা যায় না। শোয়া যায় না। মনের মত কিছু করা যায় না। আমার থেকে রাস্তার কুকুরও ভালো থাকে। কুকুররা নিজের পছন্দমত থাকার জায়গা করে নিতে পারে। আমি পারি না। আমার টাকা নেই।

রেখাকে বললাম—ইস, আমার যদি প্রচুর টাকা থাকত—

রেখা হেসে বলল—কি করতে? কত টাকা চাও?

টাকা চাই সত্যি, কিন্তু কত টাকা চাই কোনদিন ভেবে দেখি নি। সংখ্যার তো সীমা নেই।

বললাম—এক লাখ।

অত টাকা দিয়ে কি করবে?

তুমি যদি অত টাকা পাও?

আমি ছেঁড়া কাথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখি না।

ধরো স্বপ্নে তুমি এক লাখ পেলে। তখন কি করবে?

রেখা বলল, আগে পাই, তারপর ভাবব।

যাই কর না কেন, আগে ভাবতে হয়। না ভাবলে কোন কাজই করা যায় না।

তোমার মত আমি ভাবতে পারি না।

কি ভাবো তুমি রেখা?

সে কি মনে করে বলা যায়। মানুষ সব সময় ভাবে।

আমি এক লাখ টাকা পেলে ঘুম কিনে নিতাম।

হাতের আঙুল কোল থেকে এমন ভাবে তুলে চিবুক ছুঁয়ে রেখা আমার দিকে তাকাল, যেন হাতের ফর্সা আঙুল হেসে উঠল।

রেখা বলল, ঘুম কি কেনা যায়?

যদি কেনা যেত।

তুমি শরীরের খুব অযত্ন, অনিয়ম কর বলেই তোমার ঘুম কম হয়।

তুমি যেন আমার সব জানো! সপ্তাহে তো মাত্র একদিন কি দুদিন দেখা হয় আমাদের। তুমি আমার কাছে আসতে না আসতেই তো তোমার থাকার সময় ফুরিয়ে যায়।

তোমার চোখ দেখে আমি বুঝতে পারি অলীক। সারাদিন অফিস করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। বাড়িতে অন্ধ মার

কাছে। সব সময় থাকতে হয়। সংসারের সমস্ত কাজ আমায় একার হাতে করতে হয়। রোজ তোমার কাছে আসতে ইচ্ছে করে—

আস কি করে ?

একটা দিন মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চলে আসি। মা শিশুর মত হয়ে গেছে। একদম আমাকে ছাড়তে চায় না।

রাস্তায় পুজোর মন্দিরে ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে একটা বুড়ো কাশতে কাশতে চলে যাচ্ছে। ফুটপাতে একটা খোঁড়া ভিখারী বসে গান গাইছে। পনেরো বছর ধরে খোঁড়া বউটা একই জায়গায় বসে ভিক্ষে করে যাচ্ছে। মন্দির থেকে ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে।

রেখা বলল, দেখ আকাশে কেমন মেঘ জমেছে।

এই সন্ধ্যেবেলা কেন মেঘ জমল !

তারারাও আস্তে আস্তে নিবে যাচ্ছে।

এই তো আকাশে কত জ্বলন্ত তারা ছিল।

একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে না ?

আকাশটা কি মেঘে কালো হয়ে যাবে ?

কালো আকাশ আমি দেখতে পারি না।

তারারা আর উঠবে না ?

কখন উঠবে ?

মেঘ কেটে গেলে উঠবে তো ?

বললাম হয়ত উঠবে, হয়ত উঠবে না।

রেখা মাথা নাড়িয়ে বলল—সত্যি ভাল লাগে না।

আমি ঝুঁকে বললাম—কি ?

রেখা কোন উত্তর দিল না। অন্ধকার আকাশে তাকিয়ে রইল। দেখলাম একটা লোক আমার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত কেশে যাচ্ছে। আধ-বুড়ো, গায়ে ছেড়া জামা। রোগা।

লোকটা দুহাত বুক চেপে ক্রমাগত খক খক করে কেশে যাচ্ছে।

রেখা প্রায় অন্ধকার আকাশে তাকিয়ে বলল—মা কি করছে কে জানে।

আমি বিছানা থেকে নেবে জানলার কাছে চলে গেলাম। রেখার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে করল রেখার চুলে মুখ ডুবিয়ে দিই। ইচ্ছে করল রেখার কাঁধে হাত রাখি। ইচ্ছে করল রেখার হাতটা একটু ধরি। ইচ্ছে করল রেখাকে কাছে টেনে নিই।

আমি বললাম—রেখা, তোমার মা ভালো আছে। আমি বলছি ভালো আছে।

রেখা আমার মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—সত্যি ভালো হবে ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। আর তোমার মা অন্ধ কে বলেছে ? অনেকের বয়স হলে চোখে ছানি পড়ে। ডাক্তার তো বলেছে মাস দুই পরে চোখ অপারেশন করবে। ভয় কি রেখা।

অপারেশন হওয়ার পর মার চোখ যদি ভালো না হয় ?

কেন ভালো হবে না ? যে কোন অসুখ সময় মত ধরা পড়লে সেরে যাবেই।

মা ছাড়া আমার কেউ নেই।

কোন বন্ধুকে আমি স্মৃতিচিহ্ন দিতে পারি নি।

রেখা বলল—কি ভাবছ ?

বললাম—এক মৃত কবির কথা মনে পড়ে গেল।

কি কথা ? তার নাম কি ?

তার নাম যোগব্রত চক্রবর্তী। তার মৃত্যুর পর জানা গেল প্রায় প্রত্যেক বন্ধুর বাড়িতে কবি তার কোন না কোন স্মৃতিচিহ্ন ফেলে যেত। কারও বাড়িতে স্যাণ্ডেল, কারও বাড়িতে শার্ট, নয়তো পাজামা, কিংবা ট্রাউজার, মাফলার রোদ চশমা—

বন্ধুদের বাড়িতে এসব ভুল করে রেখে যেত, আশ্চর্য !

হ্যাঁ, কিন্তু সব থেকে সত্যি কি ছিল জানো ?

কি ?

সেই কবি সব সময় নতুন পরিচ্ছদ খুঁজতো বলে—জামা, মাফলার, স্যাণ্ডেল, চশমা ভুল করে ফেলে যেত।

রেখা খুব মন দিয়ে শুনল। চুপ করে থাকল। তারপর এক সময় বলল—কবি কাউকে ভালোবাসে নি ?

হ্যাঁ, ভালোবেসেছিল।

কাকে ?

এই মানুষকে। এই মানুষকে ভালোবাসতেন বলেই একটি কবিতায় বলে গেছেন—সময়ের হাতে ওড়ে মানুষের জ্বলন্ত হৃদয়।

কবিতাটা তোমার সব মনে আছে ?

মনে ছিল রেখা। এখন মনে নেই। শুধু এই লাইনটা মনে আছে। কবিতাটার নাম—ক্রমশ কবরের কাছে।

জানলা দিয়ে হঠাৎ হাওয়া এল। ঘরের ক্যালেণ্ডার নড়ে উঠল। জামা-প্যান্ট নড়ে উঠল। রেখার কপালের হালকা চুল নড়ে উঠল।

জানো রেখা, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

কি কথা ? বল।

হঠাৎ আমি রেখার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলাম। রেখার কাছ থেকে বিছানায় গিয়ে বসলাম। আমি কি একটু শোব ? না শোয়া যায় না। বসে থাকলাম।

হঠাৎ রেখা বলল—ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। আলো ধরাবে না ?

তাই তো। এতক্ষন আমরা অন্ধকারে মুখোমুখি বসেছিলাম। কই অন্ধকার তো মনে হয়নি। রেখা আমার সামনে বসে থাকলে পৃথিবী অন্ধকার মনে হয় না।

বললাম—আলো ধরাব ?

রেখা বলল—ধরাও। আমি অন্ধকারে থাকতে পারি না। দম বন্ধ হয়ে আসে।

অন্ধকারেই কিন্তু আলো থাকে।

কই আলো ধরাবে না। আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আলো ধরাও অলীক।

আমার কিন্তু অন্ধকার মনে হচ্ছে না।

রেখা হেসে বলল—'আলো মনে হচ্ছে নাকি।'

'না, তার থেকে অনেক বড় কিছু মনে হচ্ছে। আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

সত্যি, আমি তোমার জন্যে কিছু করতে

পারি না।

যখনই দেখা হয়, এই কথা একবার করে বল। মাঝে মাঝে আমার নিজেকে পাওনাদার বলে মনে হয়।

রেখা বলল—তুমি ওভাবে কথাটা নিও না। আমি মোটেই তোমায় তা ভাবি না।

জানি রেখা। তোমাকে ছাড়া আমি কিছু চাই না।

জানি, দেখ আকাশের মেঘ সরে যাচ্ছে। তারা ফুটবে।

রাস্তার মন্দিরে পূজোর ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে।

ড্রয়ারে দেশলাই, মোম। রেখা চেয়ার থেকে উঠে ড্রয়ার খুলে মোমবাতি দেশলাই বার করল। মোম ধরাল। মোম ধরিয়ে টেবিলে রাখল। ঘর ঠাণ্ডা সাদা আলোয় ভরে গেল। রেখার দিকে তাকিয়ে মনে হল—এই প্রথম রেখাকে দেখছি।

টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। আমার সমস্ত ঘরটা মোমবাতির শিখার মত জ্বলছে। আমরা সেই শিখার ভিতর বসে আছি মনে হল।

রেখা বলল—অফিসে সারাদিন বকবক করতে হয়। যার সাথে বকতে হয়। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। মা কি করছে কে জানে!

তোমার মা হয়ত ঘুমোচ্ছে।

রেখা বলল—আমার পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

লোকটা তখনও কাশছে। লোকটাকে চলে যেতে বলা যায় না। তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাশির শব্দ ঘরে আসছে। আমি উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করে দিলাম।

জানলা বন্ধ করার পর বিছানায় এসে বসলাম। রেখা বলল—মানুষ মরে যায়। বললাম—হ্যাঁ। মানুষ মরে যায়। বাঁচার পর মানুষ মরে।

বাঁচার আগেও তো অনেক মানুষ মরে যায়।

কথাটা আমার মাথায় খট করে শব্দ করল। সেই শব্দ আমার মাথায় ছড়িয়ে পড়ল।

বললাম—হ্যাঁ।

রেখা বলল—তুমি যে সুন্দর কবিতার লাইনটা বললে—সেই কবি তো বাঁচার আগেই মরে গেল।

বললাম—হ্যাঁ।

আরো অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারত।

হ্যাঁ।

মানুষ মরে যায় তাই না?

তুমি এমন ভাবে বলছ, যে মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে। আর সেটাই স্বাভাবিক ঘটনা।

মানুষ মরে যায়—কি ছোট্ট কথাটা; তাই ভাবছি।

কেন ভাবছ?

কি জানি। এমনি মনে এল। লোকটা কাশতে কাশতে চলে গেল বোধহয়।

টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। মোমের শিখার ছায়া রেখার শরীরে কাঁপছে। মোমের ফোঁটা গলে গলে পড়ছে।

বললাম—রেখা, লোকটা এখনও জানলায় কাশছে

বুঝতে পারছি না। দেখো তো।

রেখা জানলার একটা পাল্লা খুলে বলল, না, লোকটা নেই। চলে গেছে।

না যায় নি। তুমি ভালো করে দেখো, যায় নি। দেখো, কাশতে কাশতে হয়ত লোকটা বসে পড়েছে। শুয়েও পড়তে পারে।

রেখা জানলার গরাদে মুখ রেখে বলল—না, লোকটা নেই।

আ চলে যাক। হয়ত কোথাও গিয়ে, কোন বাড়ির জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কাশছে।

হতে পারে, রেখা বসে বলল।

বললাম—জানো রেখা, আমার মাঝে মাঝে গভীর রাতে কাশির শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। এই লোকটা হয়ত কাশে। সারারাত কি লোকটা কাশতে কাশতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যায়?

রেখা বলল—হতে পারে। দেখো আকাশ আবার মেঘ করে এল। মা কি করছে কে জানে। আমার ভাল লাগছে না।

রেখা আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল মোমের দিকে। আমি মোমের দিকে তাকালাম। মোম গলে গলে পড়ছে। আমি মোম থেকে রেখার মুখের দিকে তাকালাম। রেখার কপালে, নাকের পাশে ঘাম রূপোর মত চিকচিক করছে।

গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে, অথবা তার আগের সপ্তাহে রেখাকে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। রেখাদের বাড়ির পাশে একটা কবর ছিল। গভীর রাতে কবরে একটা প্রদীপ জ্বলছিল। আমার ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। সেই কবরে কোন মানুষ ছিল না। আমার ঘরের মোমবাতির সামনে আমরা বসে আছি।

রেখা আমার ভুলে যাওয়া কথাটা বলল, একটু আগে বলছিলে আমার সাথে অনেক কথা আছে। কি কথা?

ইচ্ছে করল মোমবাতি নিবিয়ে দিই। দিলাম না। বললাম, রেখা তোমার সাথে আমার অনেক কথা আছে। এত কথা আছে যে সারাজীবনেও তা ফুরোবে না। কিন্তু আমার কথার ভিতর, আমাদের কথায় অসুখ বিসুক, কাশি, মৃত্যু চলে আসছে কেন?

রেখা টেবিলে একটা হাত করুণ ভাবে রেখে বলল—হাঁা, ঠিক বলেছ। আমরা কথা বলে কেন যেন শান্তি পাচ্ছি না। আমরা কবে শান্তি পাব অলীক?

কি জানি।

আমিও জানি না।

আমিও।

রেখা অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল, এসো আমরা চুপ করে বসে থাকি।

ঠিক বলেছ রেখা, এসো আমরা চুপ করে বসে থাকি।

আমাদের কবে আবার দেখা হবে?

যেদিন আমাদের কথায় কাশি থাকবে

(শেষাংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়)

টুকরো চিঠি

অবাক কাণ্ড !

বুঝতে পারি নি এতো চিঠি আসবে ! আপনাদের চিঠি এখনো আসছে। রোজই। যে ভদ্রলোক ডাকঘর থেকে চিঠি বিলি করেন, তিনিও ঘাবড়ে গেছেন, হঠাৎ ! আপনাদের প্রত্যেকটি চিঠি পড়া হচ্ছে, এবং ছাপা হবে বলে ঠিক করে রাখা হচ্ছে। আপনাদের মনে যে এতো কথা জড়ো হয়েছিলো, ভাবা যায় না। চিঠি পাঠিয়ে যান !

বিভাগীয় সম্পাদক। টু চি

স্বামী ব্যাংকে ?

(১) অমিতাভ বচ্চন সংখ্যা। ঘ। পাতা ৯৬। আরতি গুপ্ত'র মতামতের ওপরে পরিচয়…'স্বামী ব্যাংকে। মেয়ে বি.এ পড়ছে।' ব্যাপারটা কী ? আজকাল কী স্বামীদের ব্যাংকে ডিপোজিট করা হচ্ছে ?

মিনু চক্রঃ। ভদ্রকালি

(২) করেছেন কী ? আমি বলেছিলাম, 'আমার স্বামী ব্যাংকে চাকরি করেন' ; আর আপনারা লিখলেন, 'স্বামী ব্যাঙ্কে।' কী সর্বনাশ !

আরতি গুপ্ত। কলকাতা ৮

(৩) 'স্বামী ব্যাংকে ?' কোন ব্যাংকে স্বামী রাখা যায়, একটু বলবেন ? আমার স্বামী রত্নটিকে তাহলে একবার জমা দিয়ে আসি !

সুতপা সেন। কলকাতা ২৬

—'স্বামী ব্যাংক' খোলার জন্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মোর্চা গঠন, গেরিলা কায়দায় আক্রমণ ইত্যাদি করার জন্যে একটি খসড়া রচনার দরকার হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে !

অমিতাভ

(১) ইস্যুটি চমৎকার হয়েছে !

ধীরেন দত্ত। গৌহাটি

—কা'র ? অ মি তা ভ র ? কবে হোলো ?

(২) অনেকদিন পর ঘরোয়া পড়ে খুব ভালো লাগলো। এতো চমৎকার লেখা ছবি আঁকা। তবে, অমিতাভ সম্পর্কে কিছু লেখা বেশ গরগরে।

হীরেন সেন। সোদপুর

—গর গরে ? না থর থরে ?

(৩) অ-সংখ্যা বের করে লোকটাকে এমন হ্যাটা করার কি ছিলো ? অমিতাভ বচ্চন সংখ্যা করেছেন না অমিতাভ মুণ্ডুপাত সংখ্যা করেছেন ?

রুমা বসু। চন্দননগর

—আজ্ঞে, এটা মুণ্ডুপাত সংখ্যা হোলো, এরপর বজ্রপাত সংখ্যা হবে, তারপর গ…মানে, ওই জিনিসটা, 'পাত' সংখ্যা হবে !

আত্মহত্যা ?

মেয়েরা অমিতাভর জন্যে হয়তো কিছু কম আত্মহত্যা করতো কিন্তু স্পেশাল সংখ্যায় 'মেয়েরা অমিতাভর জন্যে আত্মহত্যা করছে' পড়ে আরো বেশি আত্মহত্যা করবে !

শ্রীময় চট্টো। যাদবপুর

—জনসংখ্যা কমবে, তাহলে ? লেখক তো তাহলে ইউনেসকো থেকে প্রাইজ পাবেন !

জার্ণাল

অমিতাভ জার্ণাল পড়ে পুরোনো অনেক কিছু জানা গেলো। শীলা জোনস ভাস্কর—এনারা এখন কোথায় ?

দীপ্তি দে। দরং

—অবসর সময়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার ম্যাজিক কার্পেটের বিজ্ঞাপন পড়েন !

পত্রমিতা

A Rozario, PO box 3034, Seeb Intl Airport, Museat, Oman (Aarabian Gulf) নিয়মিত ঘরোয়া ও বান্ধবী চাইছেন। এ ছাড়াঃ বানীব্রত মণ্ডল (২২) এইচ ৮৩ দুর্গাপুর ৭১৩২০৭ / (২২) ২ সীতারাম বসু লেন ৭১১১০৬ / ভুজঙ্গ নারায়ণ (২৮) বিজনী আসাম / গৌরী গোস্বামী (২২) ২৮ গগন চৌধুরী বাই লেন ময়মনসিং বা-দে / উপযুক্ত গোস্বামী (২৯) কলেজ পাড়া বনগাঁ ২৪ পরগনা / উজ্জ্বলা সিংহ (১৬) আলিনগর কলিয়াচক, মালদহ / অশোক নন্দী (২৬) রিসার্চ হোসটেল বর্ধমান / তিলক সেনগুপ্ত (২৩) ২-এ প্রতাপাদিত্য প্লেস কলকাতা-২৬ / মোহন পাণ্ডা একেএম সাইকেল সপ লিট নিগার রোড বোম্বে-৫ / আসিফ মৈরান লিটল ১০০ শান্তি বাগ ঢাক-১৭ বা-দে / সামসুদ্দিন আমেদ ৫২-২ হাজি ওসমান গনি রোড ঢাকা-২ বা দে / শেফালী দত্ত (১৯)-৬১ এইচ ২১ মহেশ বারিক লেন কলকাতা-১৯।

(ব্রাকেটে) বয়েস শখ আলাদা করে উল্লেখ হোলো না, কেননা ছেলেরা সবাই বান্ধবী চাইছে !

পত্রমিতা কুপন

নাম……………………………………

বয়স……………………………………

ঠিকানা…………………………………

সখ……………………………………

বিশেষ ধরণের বন্ধু চাইলে এই কুপন-এর সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে লিখুন।

টু চি / ঘরোয়া / কলিকতা-১৪

হিপি-হিপি চাল চলনের জন্যে বিনোদ চিরকালই বেশ উল্লেখযোগ্য!
বোম্বের একটু ভদ্র ভাষায়, মাতওয়ালি চাল।
এবং কলকাতার চোখে বিনোদ মেহেরার চলার ভঙ্গি পুরো মেয়েলি বলে মনে হবে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যখন বিনোদ পড়তো, তখন থেকেই ছেলে-মেয়েরা ওকে দেখে বেশ ফিক ফিক করে হাসতো।

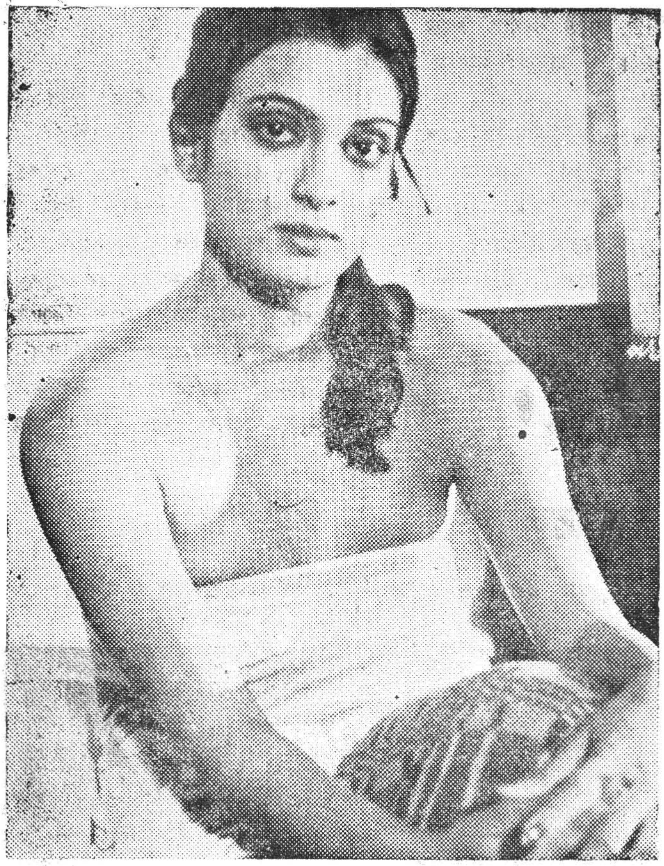
সেলিম-বিনোদ

বিন্দিয়া গোস্বামীর ডাবল ব্যারেল প্রেম!

হাসারই কথা, কেন না ব্যাটা ছেলের পাছা দুলিয়ে চলা দেখলে কেই বা না হেসে থাকতে পারে? বি এ পাশ করার পর বিনোদ চাকরি পেয়েছিলো একটা রেডিও কোম্পানিতে, কিন্তু ওর চাকরিটা যায় ওই পাছা দুলিয়ে চলার জন্যে।
কাজেই বলা যেতে পারে, বিনোদই ইতিহাসে প্রথম যে নাকি হাঁটার কায়দায়, চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিলো।
যাক, সেই বিনোদও একদিন মানুষ হয়ে উঠলো, এবং পাঁচ জনের একজন হিসেবে গণ্য হোলো।
বউয়ের আড়ালে বিনোদ যে প্রেম করতে পারে, অথবা কোনো মেয়ে যে বিনোদের প্রেমে পড়ে যেতে পারে, বিশেষ করে বিন্দিয়ার মতো মেয়ে—তা বোধ হয় স্বয়ং প্রজাপতিও ভাবতে পারেন না।
বিন্দিয়া-বিনোদের পিরীতির কথায় পরে আসছি। তার আগে একটু বিন্দিয়ার কথাটা বলি।
বিন্দিয়ারা থাকে এক মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাটে। ঘর দোরগুলো সাজানো দুবাই-য়ে কাজ করা আয়াদের মতো। দেওয়াল-ভর্তি বিন্দিয়ার নানা ভঙ্গির ছবি।
ফ্ল্যাটের নিচে দুটো গাড়ি। একটা বিদেশী। গাড়ি দেখার জন্যে একটি গার্ড আছে। মাসিক মাইনে আড়াই শো টাকা।
সেলিমের সঙ্গে বিন্দিয়ার বেশ মাখা-মাখি হয়েছিলো কিছুদিন আগেও। হেলেনকে প্রায় ভো-কাট্টা করে দিয়েছিলো সেলিমের কাছ থেকে।
বিন্দিয়ার বোনের নাম পার্ল। বেশ সুন্দরী। এয়ার হোস্টেসের কাজ করে।
বলে:
আমি আকাশের স্টার আর বিন্দিয়া মাটির স্টার।
যাক; এই আকাশের স্টার বেশির ভাগ সময়েই মাটির স্টারটিকে নিয়ে আলোচনা করে। তার ধারণা:
বিন্দিয়া এতো ভালো অ্যাকট্রেস বলেই লোকে সব সময় তার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করে। নানা কথা বলে, তবুও বিন্দিয়ার কোন কিছু কমতি যাচ্ছে না। লোকে এসে ফিরে যায় ওর

বি, আর, ইশারা পরিচালিত 'কারনামা' ছবিতে সুলক্ষণা পণ্ডিত।





ভি. এস. আজাদ পরিচালিত 'আজ ঔর অভি' ছবির বেডরুম দৃশ্যে শ্যামলী

সময় নেই বলে।

এর মধ্যে পার্ল ও পার্লের মা চট করে বিন্দিয়াকে ২৭৭ নম্বর প্রেমপত্রটি দেখান সবাইকে। কলকাতার এক ভদ্রলোক নাকি নিয়মিত বোম্বে যান শুধু বিন্দিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে।

ইতিমধ্যে সতেরো বছরের এই মেয়েটি জুহুতে এক টুকরো জমিও কিনে ফেলেছে। বাঙালী ধাচের একটা বাড়ি বানাবার ইচ্ছে আছে।

বয়েস কম হলে কী হবে, বিন্দিয়া মেয়েটি বড্ডো চালু।

বিনা পয়সায় একটা মার্সিডিজ গাড়ি অবধি সে বাগিয়ে ফেলেছে।

কেমন ক'রে ?

সেলিমের কাছে গেলো সে গাড়ি কেনার বায়নায়। সেলিমের ভীষণ দুর্বলতা আছে উঠতি বয়েসের ডাসা মেয়েদের ওপর। বিন্দিয়ারও উঠতি বয়েস, এবং ডাসা। পুরো ছুঁড়ি-ছুঁড়ি টাইপ।

সেলিমকে পটাতে বেশি দেরি হোলো না। গাড়ি তো পেলোই, সেই সঙ্গে সেলিম-জাভেদের ছবিতে ভালো ভালো কিছু রোল।

এক ঢিলে দুই পাখি!

এ সব কথা জানতে চাইলে বিন্দিয়া জবাব দেয় :

আমার মার্সিডিজ এক কালে সেলিমের ছিলো।

শ্রীমতী গোস্বামী বলেন :

আমরা সেজন্যে টাকা দিয়েছি।

কুমারী পার্ল বলে :

আমরা সেলিমের কাছে আর যাড়িয়ে যাই নি। সেলিমের এজেন্ট আমাদের খবর দিয়েছিলো...

বিন্দিয়া ফিল-আপ দেয় :

তারপর, আমি গাড়িটা কিনি।

শান বা সোলে—দুই-এ সেলিমই বিন্দিয়াকে চান্স দেয়। হেমা জিনত রেখা রিনা রায়—এদের একজনের রোলটা পাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সেলিম রোলটা পাইয়ে দেয় বিন্দিয়াকে। সেলিমের জীবনে 'তৃতীয় নারী' হিসেবে বিন্দিয়ার যে নাম, সেই সম্পর্কে বিন্দিয়ার বক্তব্য :

সেলিম শুধু আমার একারই উপকার করে নি। কানওয়ালজিৎ, নাসিরুদ্দিন শাহ—সেলিম সবারই জন্যে কিছু না কিছু করেছে। তার মানে কী এই আমরা সবাই ওর সঙ্গে প্রেম করেছি ?

সেলিমের প্রতি আমি সব সময়েই কৃতজ্ঞ। সেলিমই আমাকে রমেশ সিপ্পির কাছে নিয়ে যায়।

দেখা যাচ্ছে, বিবাহিত লোকদের সঙ্গে প্রেমে পড়ার ঝোঁক বিন্দিয়ার একটু বেশি।

সেলিম ছাড়াও আর একটি বিবাহিত লোকের সঙ্গে বিন্দিয়ার খুবই লদকা-লদকি আছে। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, লোকটি কে ?

আগে যার কথা বলছিলাম, বিনোদ মেহরা।

বিনোদ-বিন্দিয়ার আঁখ মিচোলি বা চোখ ঘসাঘসি খেলা এখন প্রত্যেকের কাছে পুরোনো হয়ে গেছে। আর এই জনরবটি বাজারে আছে বলেই—ওদের দু জনকে অনেক ছবিতে জুটি করে নামানো হয়েছে।

বিন্দিয়ার মা বলেছে :

বিনোদের মতো ছেলে হয় না। তবে আমার মেয়ে যে বিয়ে-হওয়া-কোনো পুরুষের প্রেমে পড়বে না—এটা আমি নিশ্চয়ই করে জানি।

আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে বিন্দিয়া

(শেষাংশ ৪২ পৃষ্ঠায়)

বম্বে থেকে বলছি

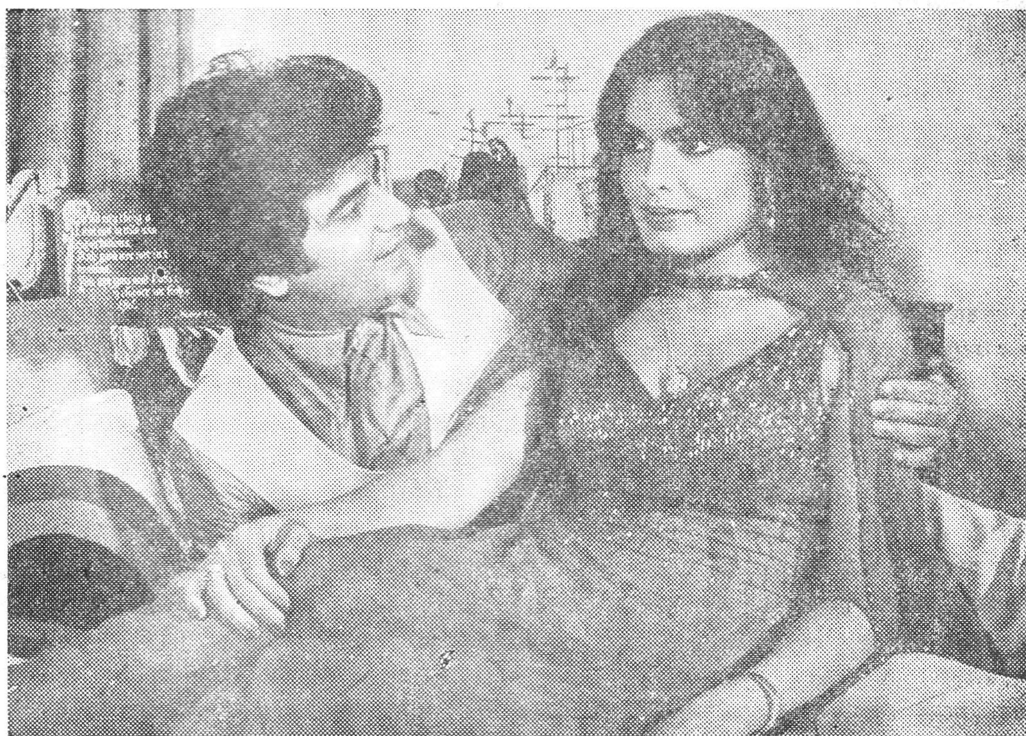
রীটা পাল

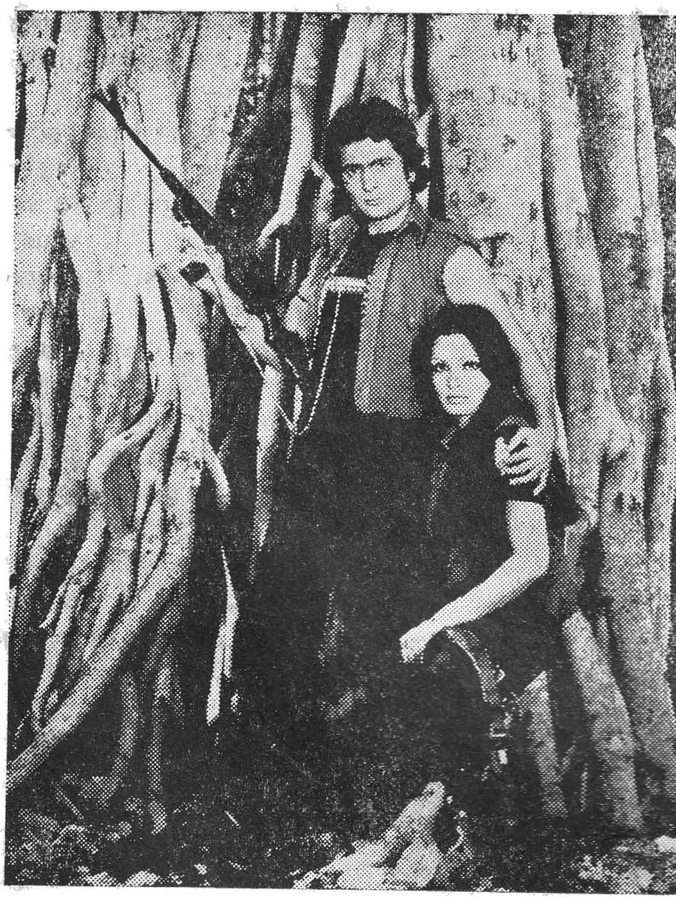
সাউথের মোস্ট সেনসেশন্যাল ডিস-কভারী হচ্ছে বিন্দিয়া। স্ক্রীন নেম বিন্দিয়া গোস্বামী। পটলচেরা চোখ, গায়ের রঙ দুধে আলতায়, (হেমার মত খানিকটা মুখের আদল আসে বৈকি, তবে শ্যামলী নয়) নাক টিকালো, হিপের মাপ যা ডবকা যুবতীদের হওয়া দরকার ঠিক তাই। অতএব শরীরের গড়নের জবাব নেই, এবার আশা করি বুঝতেই পারছেন চীজটি কেমন? সম্প্রতি কয়েকটা ছবিতে কাজ করার পর এখন তার বৃহস্পতি তুঙ্গে। প্রোডিউ-সাররা যেন তাকে সাইন করানোর জন্যে লাইন মারছে, তেমনি ছোকরা দর্শকরা তাকে ঘিরে নানারকম স্বপ্নে মশগুল। বাইচান্স কোন আউটডোর স্যুটিং-এ ছোকড়ারা যদি এহেন বিন্দিয়াকে দেখে ফেলে, তবে এমন সিটি মারে না, তখন ভীড় হটাতে প্রযোজককে পুলিশ ডাকতে হয় নইলে স্যুটিং করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বিন্দিয়া গোস্বামীর এখন দারুণ দেমাক, সাংবা-দিকদের থোড়াই কেয়ার করছে, কিন্তু বম্বে ইণ্ডাস্ট্রী সম্পর্কে এখনও লেড়কি একটু অসচেতন আছে। সাংবাদিকরা এমন সব খবরাখবর ফাঁশ করে দেবে যে তখন খুকী বুঝবেন কত ধানে কত চাল হয়। ইতিমধ্যেই তো বম্বের একটা ইংরেজী কাগজে বিন্দিয়া সম্পর্কে দারুণ একটা খবর বেরিয়ে গেছে। ছবির নামটা লেখেনি, এক স্যুটিং-এর আগে মেক-আপ নিয়ে বসে গাল-গল্প করছিল, শিল্পীরা, কলাকুশলী ও কিছু সাংবাদিকও ছিল, তাদের সামনেই নাকি বিনোদকে বিন্দিয়া চোখ মেরেছিল (আঁখ মিচোলি বলেছে বিন্দিয়া)।

পরিচালক লেখ ট্যাণ্ডন সেদিন আমায় বলে ফেললেন, আরে মত পুছ ভাই, রামেশ্বরীনে মুঝে বহুৎ তঙ্গ করতি হ্যায়। আমি ওকে অনেক সুযোগ দিয়েছি, অনেক বায়নাক্কাও সহ্য করেছি কিন্তু মেয়েটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারলুম না। লেখ ট্যাণ্ডন-এর গলায় খেদ, ভদ্রলোক বম্বে ইণ্ডাষ্ট্রির একজন পুরোনো পরিচালক। আমি বললাম, দুলহন ওহি যো পিয়া মন ভায়ে ছবিতে তো রামেশ্বরী বেশ ভাল কাজ করেছিল।

ট্যাণ্ডন সাহেব এমনিতেই দাড়ি চাঁছা পাঞ্জাবী, আমার কথা শুনে বলে উঠলেন, সেটাই তো হয়েছে সমস্যা। প্রথম ছবি

ভারতী ইনটার ন্যাশন্যালের 'প্রোডাকশন নং চার' ছবির এক রোমান্টিক দৃশ্যে জীতেন্দ্র ও পরভীন বাবী





রাহুল রাওয়েল পরিচালিত 'গুনহেগার' ছবির একটি দৃশ্যে হৃষিকাপুর ও পরভীন বাবী

রিলিজ হওয়ার পরই সে এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। সেই সময়েই আমি ভুল করেছিলাম। তখনও মেয়েটা একটু বেয়াড়া ধরণের ছিল, তবু যেভাবে বলেছি, কাজগুলো ঠিক মতো করেছিল। সায়দা ছবিতে তখুনি সাইন করিয়ে রেখেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি হাড়ে হাড়ে যে কাজটা আমি ঠিক করি নি। আমি একজন ভেটার্ণ পারসন, অনেক দেখেছি, এমন কাণ্ড করেছিল সায়রা ও বৈজয়ন্তীমালা। প্রথম ছবি রিলিজ হবার পর দুজনেই পেয়েছিল অসাধারণ জনপ্রিয়তা, তারপর তাদের কি দেমাক। প্রযোজক-পরিচালকদের নানাভাবে হেনস্থা করতে দ্বিধা করতো না, আজ তাদের অবস্থা দেখ, কেউ ভুলেও তাদের নাম উচ্চারণ করে না। আরে ভাই খেয়াল রাখনা ইয়ে বোম্বাই হ্যায় বোম্বই।

সারিকা স্যুটিং করতে গিয়ে পা ভেঙেছে। ফিল্ম সিটির দৌলত ছবিতে একটা দৃশ্য ছিল একটা উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিয়ে পড়তে হবে। প্রযোজক ডামির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু সারিকা দুম করে বললে, দূর এতে ডামির দরকার নেই। ক্যামেরাম্যানকে রেডি হতে বলে নিজেই ঝাঁপ মারবে বলে সেই উঁচু জায়গায় উঠে গেছে, পরিচালকের নিষেধও গ্রাহ্য করলোনা। ক্যামেরাম্যান রেডি সংকেত দিতেই সে ঝাঁপ মারলো। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের গোড়ালি ফ্রাকচার হয়ে গেল। সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হাঁটু অবধি প্লাসটার করে দেয় তারা। এখন সেই প্লাসটার করা পা নিয়ে দিব্যি বেড রেষ্টে রয়েছে সারিকা।

এইচ এস রাওয়েল প্রযোজিত এবং তার পুত্র রাহুল পরিচালিত গুনহেগার ছবির স্যুটিং করতে গিয়ে রঞ্জিতাও আহত হয়েছে। দৃশ্যটা ছিল মোটর বাইক নিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় এসে পাঁচ ফিটের মত ওপর থেকে লাফ দিতে হবে। এখানেও ডামির ব্যবস্থা ছিল, রঞ্জিতা ওস্তাদি করে ডামি রিফিউজ করে যেই না মোটর বাইক থেকে লাফ দিয়েছে, অমনি শরীরের নানা জায়গা ছড়ে-কেটে একসা।

ড্যানি যখনই কোন ঘোড়সওয়ারের রোলে অভিনয় করে, তখন তার একটা প্রিয় সাদা রঙের ঘোড়া ঠিক করা আছে, সেটাকে নিয়েই সে কাজ করে। প্রথম দিনের কাজ তো নির্বিঘ্নেই হয়ে গেল। চোরোঁ কি বরাত ছবির স্যুটিং চলছিল, একটা দৃশ্য ছিল, ড্যানী শত্রুঘ্ন সিনহাকে ঘোড়ায় চেপে তাড়া করবে। সেদিন ড্যানীর কপালে ছিল একটা ফাঁড়া। পরিচালক নির্দেশ দিতেই ড্যানী চেজিং সুরু করেছে, একটা জায়গায় এসে ঘোড়াটাকে একটা লাফিয়ে বেড়া ডিঙোতে হবে। ঘোড়াটা যেই লাফ মেরেছে অমনি ড্যানী ঘোড়া থেকে ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল প্রায় হাত দশেক দূরে। সে জায়গাও বেশ উঁচু ছিল, সেখান থেকেও গড়াতে গড়াতে একেবারে সমতল ভূমিতে। ভাগ্যিস ড্যানীর এ যাত্রায় কিছুই হয়নি। ডাক্তাররা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছেন কোনখানে কোন ফ্রাকচার হয়নি তবে গায়ে গতরে অসম্ভব ব্যথা রয়েছে এখনও।

সম্প্রতি পরিচালক রজত রক্ষিত কি বাং



'সাবুদ' ছবিতে নবীন নিশ্চল ও কাজল কিরণ রোমান্টিক লিডে এই প্রথম

প্রোডাকসন্সের ব্যানারে তালাক ছবির তিন দিনের এক স্যুটিং প্রোগ্রাম শেষ করলেন জুহু স্কীম ও বম্বের অন্যান্য লোকেশানে। এ পর্যায়ে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন আশা পারেখ, নবীন নিশ্চল, রঞ্জিতা ও মিঠুন চক্রবর্তী। এ ছবিটি যুগ্মভাবে প্রযোজনা করছেন দেবিন্দ্র ও সোম। গান লিখেছেন ইন্দিবর। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন উষা খান্না।

অভিনয় ফিল্ম প্রোডাকসন্স তাদের নবতম ভেঞ্চার আনাউন্স করেছেন, প্রযোজনা ও পরিচালনা করবেন বিশ্বামিত্র, ছবির নাম 'বাওরে নইন' এতে অভিনয় করবেন, রাখী, আমজাদ খান, রাজ বারবার, অরুণা ইরাণী, গুলশান অরোরা, ওম শিবপুরী, জীবন, ববি বেরী, বিমল চোপরা, নিলীমা ও রাম শেঠী। কাহিনী লিখেছেন সুরয সানিম, অমিত খান্নার লেখা গানে সুরারোপ করবেন রাজেশ রোশন। এ ছবির ফাইট কম্পোজিশন করবেন এ মনসুর।

ববি আর্টস ইনটারন্যাশনালের ব্যানারে 'বোম্বাই কা মহারাজা' ছবির এক কাওয়ালী গানের দৃশ্য সম্প্রতি মোহন ষ্টুডিওয় গৃহিত হলো, পরিচালনা করলেন শিবু মিত্র, এ পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করলেন জালাল আগা ইউনুস পরভেজ এবং একদল জুনিয়র আর্টিস্ট। ছবিটি প্রযোজনা করছেন মহেন্দ্র গান্ধী। এ ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন আমজাদ খান। সারিকা ও কাজল কিরণ এ ছবির রোমান্টিক লিডে রয়েছেন। তাছাড়া আছেন কুলভূষণ কারবান্দা, শীতল, এস, রাজন, মানমোহন, পিঞ্চু কাপুর, নরেন্দ্রনাথ এবং শক্তি কাপুর। এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন রাজু সায়গল তাঁর নিজের লেখা কাহিনী অবলম্বনে। চার খানা গান চিত্রায়িত সহ এ ছবির প্রায় তেরো রিলের কাজ হয়ে গিয়েছে। গান লিখেছেন আনজান ও নিদা ফজল, সুরারোপ করেছেন উষা খান্না! সংলাপ লিখেছেন জ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রী।

গ্র্যাণ্ড মুভিজের ব্যানারে নবতম ভেঞ্চার 'গেহরা জখম' ছবির পাঁচদিনের একটানা স্যুটিং প্রোগ্রাম কমপ্লিট করলেন পরিচালক দীপক বাহরে ফিল্মিস্থান ষ্টুডিও এবং বম্বের কয়েকটি লোকেশানে। এ পর্যায়ের স্যুটিং-এ অংশ গ্রহণ করলেন, নায়ক বিনোদ মেহেরা, সত্যেন কাপু, জগদীশ রাজ, মোহন শেঠি, দিলীপ দত্ত এবং সুন্দর। এ ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন রঞ্জিতা। ছবিটি প্রযোজনা করছেন এম, পি জৈন, কাহিনী লিখছেন চরণদাস সুখ, সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রাহুল দেব বর্মন।

এ ছাড়াও ছবির অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবেন কাদার খান, শীতল এবং আমজাদ খান।

আদনান এনটারপ্রাইজের নতুন ছবি 'মেরী জান সে প্যারে' ছবির রোমান্টিক লিডে অভিনয় করার জন্য প্রযোজক পরিচালক আমজইল খান সাইন করেছেন জরিনা ওয়াহাব ও রাজ বারবারকে। এ ছবিতে আরও দেখতে পাবেন রেহানা সুলতান, অর্পনা চৌধুরী, রাজতিলক ও শক্তি কাপুরকে। উপরোক্ত লিডিং জুটি নিয়ে ইতিমধ্যে পরিচালক তিনদিনের এক প্রস্থ সুটিং শেষ করেছেন। এ ছবির কাহিনী লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সাদাত আসরফ।

সম্প্রতি সানলাইট ফিল্মসের 'দাবেদার' ছবির একটানা ষোল দিনের সুটিং প্রোগ্রাম শেষ করে পরিচালক দুলাল গুহ পুরো ইউনিটসহ বম্বে ফিরে এসেছেন। এ ছবিটি যুগ্মভাবে প্রযোজনা করছেন তপন কুমার গুহ এবং তপন চ্যাটার্জী। এ পর্যায়ের সুটিং-এ অংশ গ্রহণ করেছিলেন রোমান্টিক লিডে ধর্মেন্দ্র ও মৌশুমী চ্যাটার্জী। এ ছাড়াও ছিলেন যোগিতাবালী, শশীকলা, জনী ওয়াকার অসিত সেন, অভি ভট্টাচার্য, রাজ মেহেরা, ব্রহ্মচারী এবং একদল জুনিয়র আর্টিষ্ট। এ পর্যায়ে দুটি গান সম্পূর্ণভাবে চিত্রায়িত করেছেন এবং উত্তমকুমারকে নিয়ে কয়েকটি ক্লাইমাক্স দৃশ্য গ্রহণ করেছেন পরিচালক। এ ছবির কাহিনী লিখেছেন রাজকুমার মৈত্র, চিত্রনাট্য লিখেছেন নবেন্দু ঘোষ। গান লিখেছেন আনন্দ বখশী, সুর সংযোজনা করেছেন লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল জুটি। সংলাপ লিখেছেন আনসারী।

অর্জুন হিংগুরানী 'কাতিলো কি কাতিল' ছবির একটি দৃশ্যে টিনা মুনিম ও একটি বাঁদর



প্রযোজক আশীষ রায় ও পরিচালক বাত্রা মাহিন্দর সম্প্রতি তাঁদের ডবল ভার্সান হিন্দী পেহরাদার ও বাংলা প্রহরী ছবির আউটডোর সুটিং-এর জন্য কুলু ভ্যালী ও মানালী অভিমুখে পুরো ইউনিটসহ রওনা হয়ে গিয়েছেন, এখানে তিন সপ্তাহ একটানা চিত্রগ্রহণ চলবে। এ পর্যায়ে তিনখানা গান চিত্রায়িত হবে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৃশ্য গৃহিত হবে বলে প্রকাশ। এতে অংশ গ্রহণ করছেন ড্যানী, কিম, রণজিৎ, সুধীর, চাঁদ উসমানী, অনিল চ্যাটার্জী এবং আরো অনেকে। গান লিখেছেন মহেন্দ্র দেলভি. সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন স্বপন জগমোহন জুটি। এই চিত্রগ্রহণ পর্ব শেষ হলেই ছবির কাজ প্রায় শেষ হবে বলে প্রযোজক আমাকে জানান।

অমিতাভ বচ্চন সম্প্রতি আর একবার প্রমান করলেন তাঁর সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে এতটুকু গলদ নেই। ভারত মুভিটোনের ব্যানারে 'এক ডাকু শহর মে' ছবির মহরত অনুষ্ঠান ছিল নটরাজ ষ্টুডিওতে গত ২১ শে অক্টোবর। সময় ছিল সাড়ে দশটা। ইতিমধ্যে দুষ্ট জনেরা রটিয়ে দিয়েছিল, আরে ওর নাম অমিতাভ বচ্চন, ওর এখন দারুণ পায়াভারী, ও থোড়াই টাইমলি আসবে, শেষ পর্যন্ত দেখো না কতক্ষণ টাইম পেছোতে হয়। কারণ অমিতাভ ক্ল্যাপ-

(শেষাংশ ২৮ পৃষ্ঠায়)

কলকাতা স্টুডিও সংবাদ

সূর্য রায়

এক অল্পবয়সী নায়িকা, (অবশ্যই নামী, আগে ছিলেন কায়স্থ এখন বিয়ে করে বামুন হয়েছেন) গত সপ্তাহে গিয়েছিলেন বসিরহাট অঞ্চলে কোন একটি ছবির স্যুটিং করতে। সঙ্গে তার ব্যাঙ্ক চাকুরে স্বামী! উঠছেন এক সম্ভ্রান্ত উকিলবাবুর বাড়িতে।
স্যুটিং হচ্ছে-খাওয়া-থাকার। কোনরকম কোন অভিযোগ নেই। বেশ চলছিল। কিন্তু গণ্ডোগোল বাধালো নায়িকার অসাধারণ পশুপ্রীতি। জন্তু-জানোয়ার অনেকেই ভালোবাসে। কিন্তু এ ভালো-বাসা একেবারে মাত্রাছাড়া। আমি এর আগেও অনেকবার দেখেছি, এবং নায়িকাটির মুখে শুনেছি তার আশ্চর্য জন্তু প্রেমের ইতিকথা! কুকুর, ছাগল বেড়াল একটা হলেই হলো—নায়িকার দরদ তার উপর উথলে ওঠে একদম। সেই নিয়ে এবারে কি ঝামেলা হলো শুনুন তা'হলে।
সারাদিন স্যুটিং হয়েছে—রাত্রে খেতে যেতে হবে অন্য একটা বাড়িতে। নায়িকা ও তার স্বামী রওনা দিলেন সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে। কাছেই বাড়ি, তবু অন্ধকার রাস্তা তাই সাবধানে চলছিলেন ওরা। ওদের ঠিক পিছনে আসছিল উকিল-বাবুরই এক ছেলে।
পুকুর পাড়ে দু'টি বেওয়ারিশ নেড়ি কুকুর মারামারি করছিল নিজেদের মধ্যে। ছেলেটি ভাবলো কুকুরটা যদি নায়িকাকে কামড়ে দেয়। কেননা নায়িকাকে যেতে হবে ঐ পুকুর পাড় দিয়েই। সে তো আর নায়িকার জন্তু প্রেমের সংবাদ রাখে না তাই একটা আধলা ইট্ তুলে নিয়ে মারলো কুকুর দুটোকে। গ্রামের ছেলে অব্যর্থ টিপ। কুকুরটা আঘাত পেয়ে চিৎকার করে উঠলো।
আর সেই চিৎকারে নায়িকার পশুপ্রীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এবং উনি তৎক্ষণাৎ নিজের বন্য স্বভাবটা প্রকাশ করে ফেললেন। কি ভাষায় বলুন তো? ভাবতে পারেন বাংলা ছবির ভদ্র নায়িকা যার বাড়িতে উঠেছেন তাকেই বলে উঠলেন,—এই কুকুরের বাচ্চা তুই কুকুটাকে মারলি কেন রে। ও তোর কি ক্ষতি করেছিল?
ভাবতে পারেন কোন ভদ্রমহিলার মুখে এ জাতীয় সংলাপ!
ছেলেটি অবাক, বললো, আমি রাস্তার

শ্রীদুর্গা চিত্রম নিবেদিত 'জয় পরাজয়' ছবির একটি দৃশ্যে সন্তু মুখার্জী ও মহুয়া
প্রযোজনা ও পরিচালনা ঠাকুর দাস হাজরা





শক্তি সামন্ত প্রয়োজিত ও পরিচালিত 'বরসাত কি রাত' ডবল ভার্সান ছবিতে অমিতাভ বচ্চন

কুকুরকে মেরেছি, আর আপনি আমায় গালাগাল দিলেন ?

দিকে দিকে এই বার্তা রটে গেল। সারাগ্রাম ভেঙে পড়লো নায়িকার কাছে। তাদের দাবী হিরোইনকে ক্ষমা চাইতে হবে !

ভুল করে নায়িকা এতটুকু দমলেন না। ভাবখানা, আমি ছবির হিরোইন, আমি সাধারণের কাছে ক্ষমা চাইবো। কভি নেহি।

যাই হোক, রাতটা কোনরকমে কাটলো। পরদিন নায়িকা বললেন, পুলিশ প্রোটেকশন ছাড়া অভিনয় করব না।

এবং করলেনও না। জনরোষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য শেষপর্যন্ত পালিয়ে এলেন কলকাতায় !

আরতি ভট্টাচার্য মা হয়েছেন। গত অষ্টমী পূজোর দিন উনি এক পুত্র সন্তানের জননী হয়েছেন। জানা গেছে, মা-পুত্র দু'জনেই ভালো আছেন। এ সপ্তাহেই আরতি পুত্রসহ কলকাতায় ফিরে আসছেন এবং এরপর উনি বকেয়া ছবির কাজে অংশ নেবেন বলে মনস্থ করেছেন।

উত্তমকুমারকে পরিচালকরূপে দেখা নিঃসন্দেহে এক স্মরণযোগ্য ঘটনা। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, পীযুষ বসুর আকস্মিক পরলোক গমণের পর 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'র পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নেন উত্তমকুমার। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিওতে শর্মিলা ঠাকুরকে নিয়ে ঐ ছবির এক প্রস্থ স্যুটিং হয়ে গেল।

'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'র প্রযোজক সুব্রত মুখার্জী এ ছবি নিয়ে কেবলই বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। যেমন দেখুন, ছবিটি তৈরীর পরিকল্পনা হয়েছে দীর্ঘদিন কিন্তু পীযুষবাবু ব্যস্ত কিংবা শিল্পীদের ডেট সমস্যা থাকায় এতদিন ছবি শুরু করা যায় নি। অতঃপর শুরু হলো, তার পরেও কিন্তু ফাঁড়া কাটছে না।

কয়েকদিন স্যুটিং করে প্রযোজক গেলেন বোম্বেতে। সেখানে রাহুলদেব বর্মনকে দিয়ে গান করাতে। তা শোনা যায় এখানেও নাকি কিছু অসুবিধার সম্মুখিন হয়েছিলেন।

যাই হোক, গান শেষ করে কলকাতায় ফিরে শুনলেন, পীযুষবাবুর মৃত্যু সংবাদ। এবং তারপরেই কয়েকদিন বাদে সুপ্রিয়া দেবীর 'অবসর' নেবার ঘোষণা ! এ ছবিতে সুপ্রিয়া প্রায় দিন সাতেক স্যুটিং করেছেন। আর মাত্র দিন তিনেকের স্যুটিং বাকি আছে, এমন সময় এহেন সংবাদ যে প্রযোজক সুব্রত মুখার্জীকে বিমূঢ় করে দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? গ্রহের ফের কি একেই বলে ? আমার সঠিক জানা নেই।

আমি যেদিন ফ্লোরে গিয়েছিলাম সেদিন

আশা ভোঁসলের গাওয়া একটি গান পিকচারাইজেশন হচ্ছিল। নৃত্য সহযোগে উজ্জ্বল পোষাকে ঐ গানে লিপ মেলাচ্ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর। শ্রোতা বা দর্শক হিসাবে অনেকের সঙ্গে ছিলেন অসিতবরণ। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরা বসিয়ে দৃশ্যটি গ্রহণ করা হচ্ছিল।

ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্তের মূল উপন্যাসটি যাদের পড়া আছে তাদের জন্য ছবির সম্পূর্ণ চরিত্র লিপিটা তুলে ধরছি। উত্তমকুমার (রাজশেখর) সুপ্রিয়া দেবী (সুরেশ্বরী) মিঠুন চক্রবর্তী (শশাঙ্কশেখর) শমিত ভঞ্জ (সূর্যকান্ত) সোমা (স্বর্ণময়ী) সন্তু মুখার্জী (রঘুবীর) রবীন ব্যানার্জী (রাঘব) শম্ভু ভট্টাচার্য (মুরারী) নবাগতা স্বরূপ (মাধবী) অসিতবরণ (ওস্তাদজী) উৎপল দত্ত (?) ও অপর্ণাবাঈ ও কঙ্কাবতী'র চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর। পর্ণা চিত্রমের এ ছবির চিত্রগ্রহণ করছেন বিজয় বোস। শিল্প নির্দেশনায় আছেন সূর্য চ্যাটার্জী। সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী। রাহুল দেব বর্মনের সুর এবং স্বপন চক্রবর্তীর কথায় ছবির গানগুলি গেয়েছেন লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁশলে, পরভীন সুলতানা ও কিশোরকুমার। এ ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন, দীপক ফিল্মস এণ্টারপ্রাইজ।



'পতিতা' ছবির একটি দৃশ্যে রাজকিরণ ও সোমা

পরিচালক তপন সিংহ আগামী জানুয়ারী মাস থেকে তার নতুন ছবির কাজ শুরু করছেন। মনোজ মিত্রের বিখ্যাত নাটক 'সাজানো বাগান'-এর কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত এ ছবির নাম হবে 'বাঞ্ছারামের বাগান'। এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ হলো তপনবাবুর সুরে উত্তম কুমারের গান। ইষ্টম্যান কালারে এবং ডি, কে, ফিল্মস এণ্টারপ্রাইজের ব্যানারে নির্মিত এ ছবির চরিত্রলিপি এখন পর্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে যা জানা গেছে তা' হলো, মনোজ মিত্র (বাঞ্ছারাম) মাধবী চক্রবর্তী (নকুড় দত্তের স্ত্রী) শ্যামল সেনগুপ্ত (চোর) ভীষ্ম গুহঠাকুরতা (গুপী) বিপ্লব চ্যাটার্জী (কোৎকা ঘোৎকা) রবি ঘোষ (ডাক্তার) দেবিকা মুখোপাধ্যায় (গুপীর বৌ পদ্ম) এবং উত্তমকুমার (ন' কড়ি দত্ত ও ছ' কড়ি দত্ত)।

গত ৩রা নভেম্বর টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে অপু ফিল্মসের 'শূন্য পৃথিবী' ছবির শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হলো দৃশ্য গ্রহণের মাধ্যমে। মহরৎ শর্টের ক্ল্যাপষ্টিক দেন বিকাশ রায়। দৃশ্যে অংশ নেন অপু মজুমদার ও রূপা দাশ। চিত্রগ্রহণ করলেন দীপক দাশ। শিল্প নির্দেশক হলেন, রবি চট্টোপাধ্যায়। গানে সুর দিচ্ছেন অনিল দত্ত। অপু মজুমদার প্রযোজিত এ ছবিটি স্বরচিত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন সমীর মুখার্জী।

সোমনাথ রায় ও মোহন মল্লিক প্রযোজিত রেবা ফিল্মসের প্রথম ছবি 'পাকা দেখা'র দুদিন ব্যাপী দৃশ্যগ্রহনের কাজ সম্প্রতি হয়ে গেলে ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে। বনফুল-এর কাহিনী অবলম্বনে স্বরচিত চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। গানে সুর দিয়েছেন হেমন্ত মুখার্জী। বনফুল ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত ছবির গানগুলিতে কণ্ঠ দিয়েছেন তরুণ

ব্যানার্জী, সাগর সেন, অমল মুখার্জী অরুন্ধতী হোম চৌধুরী ও সুরকার স্বয়ং। চিত্রগ্রহণ করছেন পিন্টু দাশগুপ্ত। মুখ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, তরুণকুমার, বসন্ত চৌধুরী, জয় সেনগুপ্ত ও মহুয়া রায় চৌধুরী।

ভারত বিকাশ ফিল্মসের প্রথম নিবেদন, যুগল কিশোর শারাফ প্রযোজিত 'বৌ কথা কও' ছবির ধারাবাহিক দৃশ্য গ্রহণের কাজ এ সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বরচিত চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করছেন উদীয়মান পরিচালক রানা সেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানগুলিতে সুর দিয়েছেন নীতা সেন। চিত্রগ্রহণে আছেন, শংকর সরকার। সম্পাদনায় নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য। শিল্প নির্দেশনায় অমিতাভ বর্ধন। নেপথ্য কণ্ঠ শিল্পীরা হলেন, আরতি মুখার্জী, ভূপেন্দ্র সিং, সুধীন সরকার, কমল গাঙ্গুলী ও কার্তিক-বসন্ত। ছবির মুখ্য শিল্পীরা হলেন, সুমিত্রা মুখার্জী, দীপংকর দে, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, মৃণাল মুখার্জী, সান্ত্বনা বোস, শ্যামল রায় চৌধুরী, বঙ্কিম ঘোষ, পদ্মা দেবী, নীহার চক্রবর্তী ও গীতা দে।

'তাকত' ছবির একটি দৃশ্যে পরভীন বাবী, ডিম্পু এবং বিনোদ খান্না



বম্বে থেকে বলছি
(২৪ পৃষ্ঠার পর)

ঠিক দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ঠিক নির্ধারিত সময়েই অমিতাভ বচ্চনের গাড়ি নটরাজ ষ্টুডিও প্রাঙ্গনে পৌঁছে গেছে। যাঁরা তাঁকে গাড়ী থেকে নেমে ফ্লোরে আসতে সাহায্য করছিলেন, তাদের মধ্যেই একজন বলে উঠল, আপ বিলকুল টাইম পর পৌঁছ গয়ে। অমিতাভ একটু হেসে জবাব দিলো, কেয়া সমঝে, ম্যায়ভি দিলীপ কুমার কেয়া। দিলীপ কুমার কখনও কোন মহরত অনুষ্ঠানে সময়মত গিয়ে উঠতে পারেন না। টেক হয়ে যাবার পর তিনি এসে উপস্থিত হন। সেদিন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন আমজাদ খান ও সারিকা। অমিতাভ ক্ল্যাপষ্টিক দিতেই ক্যামেরা চালু হল। এবং দারুণ উত্তেজনার মধ্যে মহরত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। এই ছবিতে 'ডাকু'র ভূমিকায় অভিনয় করছেন আমজাদ খান। সেদিন আবার তাঁর জন্মদিন ছিল। মহরত অনুষ্ঠান শেষ হবার পর তিনি বার্থ-ডে কেক কাটলেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে জন্মদিন পালিত হল। 'এক ডাকু শহর মে' ছবিটি পরিচালনা করছেন কালিদাস, প্রযোজনা করছেন গুণবন্ত মোদী।

প্রদীপ প্রোডাকশনের প্রথম নিবেদন পরিমল ঘোষ পরিচালিত 'সুপর্ণা' ছবির কাজ শেষ। ছবির সুরকার হলেন, সুধীন দাসগুপ্ত। প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন, মাধবী চক্রবর্তী, শমিত ভঞ্জ, সত্য ব্যানার্জী, তরুণকুমার, অজিতেশ ব্যানার্জী, দিলীপ চ্যাটার্জী, দীপ্তি রায়, গীতা দে, নির্মলকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, সবিতাব্রত দত্ত, বঙ্কিম ঘোষ, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, বর্ণালী মিত্র ও মহুয়া রায় চৌধুরী।

চামচা দর্শন

আচ্ছা স্যর, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি উইথ ইয়োর কাইণ্ড পারমিশান কিছু মনে করবেন না প্লীজ। অতীত দিনে মহারাজা রাজা উজির নাজির জমিদার ম্যায় তাদের নায়েবদেরও চামচা ছিল। এযুগে তাদের দিন গত হয়েছে, এসেছে বিগ অ্যাণ্ড জয়েন্টস সব ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের দিন, তাঁরা দেশের সরকার চালান, শুধু অঙ্গুলি হেলনেই ইচ্ছাপূরণ বস্তুটা হয়ে যাচ্ছে, সে যে কোন ক্ষিারে হোক না কেন! আমি যেহেতু নাম্বার ওয়ান চামচা অতএব এর চেয়ে খোলাখুলি আর কিছু বলতে পারবো না, বললে আর রক্ষে নেই, লাশ পড়ে যাবে। আপনারা সবাই বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী, কোথা দিয়ে কী হয় আর হয় আর না হয় তা আপনাদের জানা আছে। আমি একজন বশংবদ চামচা হয়ে কি কোন দোষ করেছি?

কোই গুনাহ নেহি বেটা, এতো বিলকুল আচ্ছে কাম হ্যায়, এক পার্টিতে সেদিন ওমপ্রকাশজী মদের গ্লাসে চায়ে চিনি মেশানোর মত চামচ দিয়ে বরফকুচি হুইস্কির সঙ্গে মেলাতে মেলাতে বললেন। আমিও দারুণ চালু পুরিয়া, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে আচমকা তার পায়ের ধুলো নিয়েছিলাম। হুইস্কির রঙিন নেশায় মশগুল হয়ে তিনি বলেছিলেন, হর জমানামে যেইসা চামচা থে এ জমানামেও চামচাগিরি রহেগা ঔর রহেগী। কেয়া সমঝা?

আমি জবাব দেব কি! ওমপ্রকাশজীর পাশেই বসেছিলেন দাদামণি (অশোককুমার), তিনি বললেন, বিলকুল সই বাত, চামচালোগ গায়েব হো জানেসে

কেষ্ট চ্যাটার্জী পরিচালিত এখনও নামকরণ হয় নি ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে বিন্দ্যা সিনহা, গুলজার, প্রযোজক কেষ্ট চ্যাটার্জী, মিঃ খান্না, উষা খান্না



তো দুনিয়া গায়েব হো জায়েগা।
ওমপ্রকাশজী আবার মাথা দুলিয়ে বললেন, কেয়া সমঝা বেটা?
আরে ভাই ম্যায় তো সোচ সমঝ করই, এ ধান্দা চুন লিয়া, মনে মনে বললাম আমি। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে কীচাঈন হতে পারে, এই ভেবে সট সরে পড়লুম।
বিরাট পার্টি। রহিস ব্যক্তিদের দারুণ ভিড়। এর মধ্যে যেমন হাজি মস্তান সাহেবের মত টপ তেজারতীর কারবারী আছে, তেমনি ফিল্ম দুনিয়ার টপ প্রযোজক থেকে সুরু করে আছেন টপ হিরো-হিরোইনরা। এ ছাড়াও এসেছেন কিছু মক্ষীরানী। এরা কারা?
ডোণ্ট আসক। মাফ করবেন, বলতে পারবো না। সত্যি কথা লিখতে গেলে আগেই বলেছি তো—জান যাত্রে মে।
এই পার্টি থ্রো করা হয়েছে ওবেরয় শেরাটনে। এই পার্টি মানেই হচ্ছে মৌচাক। তা আপনি বলুন মৌচাকে মক্ষীরানী অনুপস্থিত থাকলে কি জমে?
এই মক্ষীরানীদের মেক-আপ দেখলে অনেক সময় নাম করা হিরোইনরা পর্যন্ত ভিরমি খাবেন। কেন তারা আবার ভিরমি খেতে যাবেন কেন? তারাও তাদের নিজস্ব মেক-অপ-কার দিয়ে পুরোপুরি মেক-আপ নিয়ে তবে পার্টিতে এসেছেন?
আই এগ্রি। কিন্তু তবুও বলছি মক্ষীরাণীরা মেক-আপ করে একেবারে নামী সংস্থায় গিয়ে—ধরুণ রাত আটটায় পার্টি অ্যাটেণ্ড করতে হবে, এরা প্রস্তুতি সুরু করেন বিকেল চারটে থেকে। যেমন মেক-আপে কোন খুঁত পাবেন না, তেমনি তাদের পরিধেয় দেখলে চোখ ফেরানো যাবে না, যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিড়ে আপনার পাশ দিয়ে কেউ গেল, তাহলে সারারাত সেই ইনটিমেটের গন্ধটা আপনার নাকে লেগে থাকবে।
এ সব কথা এখন থাক। এবার আপনাদের একটা গল্প শোনাব। একবারে সত্যি ঘটনা।
অবশ্য অনেকদিন আগের কথা। আমি তখন কলকাতার এক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সিনেমার পাত দেখতাম আর কি। তখন গুরু দত্ত সাহেব বেঁচে। ওর সঙ্গে আমার দারুণ খাতির ছিল। উনি সে-বার কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁর তখনকার ছবি বাহারে ফিরভি আয়েগী ছবির সুটিং-এর কাজ করতে, কলকাতার আশে পাশের কয়েকটি লোকেশানে। তারপর কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি একদিন কিছু বাছা বাছা সাংবাদিকদের গ্র্যাণ্ড হোটেলের নিজের কামরার ডাকলেন, ছোট-খাট একটা গেট টুগেদার আর কি?
বাঘা বাঘা সাংবাদিক উপস্থিত হলেন নির্দিষ্ট সময়ে এবং এর মধ্যে দু-একজন নামী দামী লেখকও ছিলেন। আমিও এই পার্টিতে উপস্থিত হয়েছি। বিশিষ্ট সাংবাদিক হিশেবে নয়, গুরু দত্তের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এ কথা আগেই বলেছি।
আটটা থেকে পার্টি সুরু হোল, একেবারে স্কচ হুইস্কি দিয়ে। গেলাসের পর গেলাস নিমেষে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে চলছে নানা রকম গল্পগুজব। খাবার দাবারের প্রচুর বন্দোবস্ত। যে যেমন খুশি খাও আর কি। পার্টি চলছে, এদিকে যে ঘড়ির কাঁটা নিয়ম মত এগিয়ে চলেছে সেদিকে কারোর খেয়ালই নেই। রাত সাড়ে এগারোটার সময় কয়েকজন সাংবাদিক গুরু দত্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু গুরু দত্তের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্টতা একটু বেশি তারা আর ছাড়া পেলেননা। পার্টি চলতে থাকলো, রাত দুটোর সময় হঠাৎ গুরু দত্ত বললেন, আরে এই সময় যদি একটু লক্ষ্ণৌ বাঈজীর মুজরো দেখা যেত ভারী জমতো, কী বলেন! তৎক্ষণাৎ তাঁর কলকাতার পরিবেশকের লোককে বললেন, কিউ ভাই, আচ্ছে কোই লক্ষ্ণৌবালী বাঈকা ইন্তেজাম হো সকতা!
সে বললো। কিঁউ নেহী কিঁউ নেহী। জরুর সাহেব ম্যয় আভি ইন্তেজাম করতা হুঁ।
আজ এখানেই শেষ করলাম। আগলে সপ্তেমে ফির মিলেঙ্গে। খুদা হাফেজ।

মিনিদি'র আসর

ঘরোয়া-য় 'মিনিদির আসর' এককালে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো সব বয়েসী মেয়েদের কাছে। (প্রসঙ্গত, পনেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের স্ত্রী মিনিদির কাছে 'মেয়ে'!)—আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি মিনিদি আবার তাঁর আসর ঘরোয়া'র পাতায় এই সংখ্যা থেকেই সুরু করে দিয়েছেন কাজেই, আপনার যে কোনো সমস্যা আছে আশা আনন্দ আকাঙ্খার কথা জানিয়ে চিঠি দিন, আপনাদের প্রত্যেকটি চিঠি, সেই সঙ্গে উত্তর ছাপা হবে স-যত্নে। না! ফোন করবেন না, শুধু চিঠি দিন। মিনিদির আসরের সঙ্গে এবার থাকবে একটি নতুন ব্যাপার, ব্যাপারটি আর কিছু নয় 'সেই মুখ নামে একটি ছবির ফিচার। আপনার চেনা যে কোনো সুন্দর-মুখের ছবি পাঠান, সঙ্গে পরিচয় লিপি দিয়ে, আমরা ছবিটি ছাপবো। এবং, এ ছবি যদি আপনার কপালে থাকে এমন কারুর চোখে পড়ে যেতে পারে—যে আপনাকে রিসেপসন গার্ল-এর চাকরি থেকে মডেলিং ইত্যাদি নানাবিধ ভদ্র চাকুরির সুযোগ দিতে পারবেন। হ্যাঁ, সঙ্গে আপনার এডুকেশন্যাল কোয়ালিফিকেশন দেবেন। কাজেই সংযোগিতা করুন। চিঠি পাঠান এই ঠিকানায়:
মিনিদি C/o ঘরোয়া ৭৯/৫ বি আচার্য জগদীশ বোস রোড কলকাতা-১৭

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, বিনোদ খান্না হালুম হালুম করে স্মিতার প্রেমে পড়ে গেছে। আর প্রেমটা অ্যায়সা জমেছে যে, গীতাঞ্জলি বিনোদের বউ পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে, বিজি যাই হোক, স্মিতাও তো আর পাঁচটা মেয়ের মতো।

হৃদয়ের ব্যাপার-স্যাপারে কী চুপ করে থাকতে পারে ?

কভি নেহি।

আর সেইজন্যেই তো সে কী করে প্রেমে পড়ে গেছে বিনোদ খান্নার। বিনোদ খান, না বিনোদ—তবে উদাসী মেয়েদের বিনোদন হিসেবে বিনোদ যেটা খান—সেটা নিরোধ করা বড্ড শক্ত।

স্মিতা / বিনোদ খান্না ঃ ব্যাপারটা কী ?

কী করবে, কী বলবে কিছু ঠিক করতে পারছে না।

অথচ, গীতুর মতো মেয়ে হয় না। সব সময়ে হাসি খুশি, মিষ্টি করে কথা বলা, এইসব গুণ গীতুর ছিলো। সেই গীতুর অবস্থা এখন এমন যে মুখে বলা যায় না। হাসি মুছে গেছে, কারুর সঙ্গে কথা বলে না, সারাক্ষণ ছটফট করে বেড়ায়, একবার কথা বললে দশবার ফুপিয়ে কেঁদে ফেলে। বেচারা ! ফিলম স্টারদের বউরা যে কত দুঃখে থাকে, তা ওপর থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না।

বিনোদকে এখন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে স্মিতা। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক।

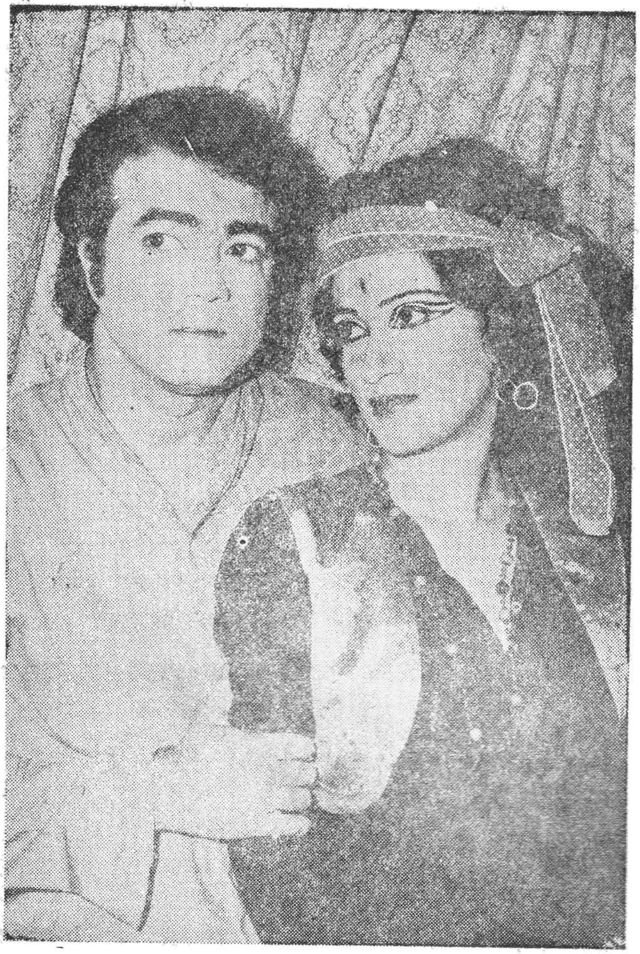
স্মিতার মতো, ভালো মেয়ে কি না জানি না, তবে বুদ্ধিমতি, যাকে বলে চালু মেয়ে, পাওয়া বড়ো শক্ত। বলতে গেলে বুদ্ধিই স্মিতার একমাত্র অস্ত্র।

সাধারণভাবে স্মিতার পরিচয় অসাধারণ, আঁতেল মেয়ে হিসেবে। মাঝে তো একবার জার্ণালিস্ট হওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলো, এমন কি টাইপ রাইটারে ASDF ইত্যাদি রপ্ত করতে সুরু করে দিয়েছিলো।

আঁতল হোক, অসাধারণ হোক, হিজি-

কাতিলোঁ কি কাতিল ছবির একটি দৃশ্যে নায়িকা টিনা মুনিম নায়ক ঋষি কাপুরের পার্স নিচ্ছেন সঙ্গে বুঝি হৃদয়ও





রঙমহল মঞ্চে 'পিউ কাঁহা' নাটকের বিশেষ মুহূর্তে
সুখেন্দু মুখার্জি ও মিস ববি

শোনা যাচ্ছে, স্মিতা নাকি জীবনে এই প্রথম প্রেমে পড়লো। কথাটা কেমন যেন জীবনে প্রথম কুমারীব্রত ভাঙার মতো শোনাচ্ছে।

বিয়ে? হ্যাঁ, বিয়ে মানেই বন্ধন সারা জীবনের একঘেয়েমি—ব্যর্থতা ক্রীত-দাসত্ব স্বাধীনতা হারানো ইত্যাদি

বিনোদ প্রেমিক হিসেবে শান্ত ভদ্র ধীর স্থির বিনয়ী ধর্মভীরু, এক কথায় এমন একটি ছেলে, বা প্রেমিক সে, যে কোনো মেয়েই ওকে জবরদখল করে (না, জার্মান মেয়েদের মতো রেপ করে নয়!) রেখে দিতে চাইবে।

মুশকিল, বিনোদ বিবাহিত। আবার এমন একজনকে বিনোদ বিয়ে করেছে যে কোনোদিন তাকে ছেড়ে যাবে না।

অবশ্যি। বউ বাদেও অন্য মেয়ের পক্ষে বিনোদ যে ইতি উতি করে নি, তা নয়। করেছে। তবে, বেশীর ভাগটাই বউয়ের চোখের আড়ালে।

বিবরণে প্রকাশ, হ্যাঁ, স্মিতার মধ্যে বিনোদ নাকি তার হারানো আত্মা ফিরে পেয়েছে (সাবাস গুরু রাজনীশ!) এবং এই আত্মাটিকে সে কিছুতেই ছাড়তে রাজি নয়, তার আত্মারাম খাচা ছাড়া হলেও। ('আত্মা! কী ওই জিনিসটাকেই বলছে রাজনীশের শিষ্য?) প্রেমে পড়ে কি স্মিতারও জ্ঞান চক্ষু বেশ খুলে গেছে। সে-ও রাজনীশের আশ্রমে যাতায়াত সুরু করে দিয়েছে, যাতে বিনোদের কাছে যাবার সুবিধে হয়।

তাছাড়া, প্রেম করার চমৎকার জায়গা পুণা। বোম্বেতে বিস্তর ঝামেলা! ফিল্মিওলারা সব সময়ে স্মিতাকে কবজা করে রেখেছে। শত্তুরের ভয় নানা দিকে।

স্মিতা নাকি অপেক্ষা করছে। বিনোদ ফিল্ম করা ছেড়ে দিয়ে নাকি ওকে বিয়ে থা করে সুখে শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটাবে।

এখানে, একটা কথা বলার আছে।

স্মিতার সঙ্গে প্রেমে পড়ার আগে বিনোদ শাবানার সঙ্গেও এই রকম ঘোড়-দৌড় প্রেম করেছিলো। গীতাঞ্জলিকে ডিভোর্স করে শাবানাকে বিয়ে করবে, এই রকম একটা কথাও উঠেছিলো।

কিন্তু শেষ অবধি গীতাঞ্জলিকে আর দুই ছেলেকে, বিনোদ আর ছেড়ে যেতে পারে নি। আর শাবানার ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথাও ঘামায় নি।

শাবানার জন্যে যে ঘর ছাড়তে পারে নি, সে কী স্মিতার জন্যে ঘর ছাড়তে পারবে?

বলা মুশকিল, একদিকে পেয়ার কিয়া ডরনা কেয়া সেন্টিমেন্ট, অন্য দিকে ইজ্জত কি সোয়াল!

অন্যদিকে বিনোদ তো একটা গিমিক দিয়েই বসেছিলো: আর ছবি করবো না। তারপর, হাল বেহাল হতে আবার ছবি করতে লেগে গেছে।

বিয়েটা?

হ্যাঁ, বিয়েটা এবার বোধহয় কাট্টুম-কুট্টুম হয়ে যাবে। আর বিয়ে করে দরকারই বা কী বিন্ বিনের?

কিছুকাল আগে উদয়পুরে বিনোদ এক মেয়ে জার্নালিস্টের সঙ্গে এমন লটর-পটর করলো যে কেচ্ছার ভয়ে মেয়েটি চাকরি ছেড়ে বাড়ি চলে গেলো! শাবানা আজমিকে নিয়ে বিনোদ আর শশীর মধ্যে মারপিটের উপক্রম অবধি হয়ে-



বি আর চোপরা পরিচালিত 'ইনসাফ কা টরাজু' ছবির একটি দৃশ্যে রাজ বারবার ও জীনত আমন

ছিলো।

সব চেয়ে বড়ো কথা, সুনীল দত্ত, যে বিনোদকে বহু সুযোগ সুবিধে দিয়েছে, সেই সুনীল দাতকে অবধি বিনোদ আজকাল পাত্তা দিচ্ছে না। সঞ্জয় দত্ত'র সঙ্গে ছবি করার জন্যে সুনীল অনুরোধ জানিয়েছিলো বিনোদকে, কিন্তু বিনোদ গ্রাহ্যও করে নি!

বিনোদ খান্নার এখন একমাত্র বন্ধু গোলডি। (জানেন বোধহয়, গোলডি কিছুকাল আগে ওর নিজের ভাইঝিকে বিয়ে করেছে?)

শশী আর বিনোদের মধ্যে অনেকদিন কথা বন্ধ। বিনোদ বলেছে।

শশী আমাকে ভুল বুঝেছে। এক বছর আগেও আমি জানতাম না শশী আর শাবানার মধ্যে কিছু চলছে।

শাবানা আমাকে বলেছিলো, শশী এমন খোঁচা মেরে মেরে কথা বলে, তুমি চুপ করে সহ্য করো কেন?

সঞ্জয় জিনত জরিনা পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিনোদের কথা হোলো:

ওসব কথা আর কেন?

বিয়ে সম্বন্ধে বিনোদের কথাবার্তা আরো ফ্র্যাংক।

বলেছে: বিয়ে করে মস্ত ভুল করেছি।

সত্যিই, বিনোদ ভীষণ ভুল করেছে, অন্তত গীতাঞ্জলির মতো একটা মেয়েকে বিয়ে করে।

বিনোদ সম্পর্কে পুরো আলোচনা করা, এই মুহূর্তে, নিরর্থক। কেননা, শ্রীমান অনেকরকম প্যাচ পয়জার জানে। লক্ষ করার বিষয়, বাজার যখন ওর খুব টাইট, তখন দারুন এক স্টান্ট দিলো সে রাজনীশের আশ্রমে গিয়ে।

রাজনীশ আশ্রমে নাম লেখাতে পারলে একটা সুবিধে সব সময়েই পাওয়া যায়, তা হোলো যে কোনো প্রেম সম্পর্কিত গোপন অ-গোপন ব্যাপার বেশ ভক্তিরসে জর্জরিত করে রসালো করে দেওয়া যায়, এবং কেউ কিছু বলে না।

(শেষাংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়)

মিনিদির আসর

বড় সওদাগরী অফিসে কাজ করি। এক সহকর্মীর সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়া করে ভালোবেসেছি। আমাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্টতা গড়ে উঠেছিল। অফিস ছুটির পরে, রেঁস্তরায় একান্তভাবে বসে গল্প, তারপর বেড়ান, মাঝে-মধ্যে সিনেমা দেখাও চলত। কিছুদিন আগে হঠাৎ বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি সে ইতি-মধ্যেই একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছে এবং তার একটি ছেলেও আছে। এত সব জেনে আমি এখনও তাকে আগের মত ভালবাসি। এখন আমার কি করা উচিত?

নীলিমা বসু ॥ দমদম

—এটা কি ধরণের প্রশ্ন হলো! আপনার ভালোবাসার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জেনে শুনে কোন মেয়ের পক্ষে এ ব্যাপার অসম্ভব। ভালোবাসার সঙ্গে ভালোবাসা, ইংরেজিতে যাকে বলে ইনফ্যাচুয়েশান, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। আপনার ভালবাসাটা নিছক সেকসুয়াল কী না সেটা ভেবে দেখা উচিত। কামগন্ধহীন ভালবাসা অর্থহীন ব্যাপার। স্বর্গীয়ই হোক আর দৈহিকই হোক, ভালবাসার ডেফিনিশানের কোন বিকল্প নেই। অতএব এ ব্যাপারে একটি সৎমনোভাব থাকা প্রয়োজন অথবা সৌজন্যতা। তোমার সৌজন্যহীন প্রেমিককে অবিলম্বে বাই বাই জানিয়ে নতুন সহৃদয় কাউকে খুঁজে দেখ। শুভেচ্ছা রইলো ভাই।

আমি একটি ছেলেকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। গোড়ার দিকে ব্যাপারটা গোপন ছিল। কিন্তু পরে উভয় পরিবারের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায়। আমাদের বাড়ী অতটা সংরক্ষণশীল নয়, ছেলেটা কিন্তু বাবা-মা'র খুব বাধ্য, ওরা ভারি গোঁড়া। জানাজানি হওয়ার পর থেকে সে আর আমাদের বাড়ী মুখো হয় নি। আমার সঙ্গে বাইরে কোথাও দেখা করতে চায় না। তবে মাঝে মধ্যেই এক বন্ধুকে দিয়ে ফোন করিয়ে আমায় জানায় যে, সে আর একটি মেয়ের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে সুরু করেছে। দিদি আমার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। এখন আপনি সহায়।

মৃদুলা বাগচি ॥ দুর্গাপুর

—এতে ভেঙে পড়ার তো কোন মানে হয় না। তুমি তোমার বয়স উল্লেখ না করলেও আমি বলব, এটা বয়সের ভুল। বয়স বাড়ার সংগে সংগে এ ধরণের ভুলগুলি আবার শুধরে যাবে। তুমি মারাত্মক ভুল করেছিলে। যে ছেলের নিজের কোন ব্যক্তিত্ব নেই, মতামত নেই দায়িত্ব নেই, মা-বাবার কথায় চলে, বিশেষ করে এ সব ব্যাপারে, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। আরও বেশি এগিয়ে গেলে বিপদের আশঙ্কা ছিল। আমার স্থির বিশ্বাস, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। মনকে সান্ত্বনা দাও ঠিক হয়ে যাবে। যদি পারো তবে তোমার রোমিওকে একটি শাড়ি কিনে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিও, কেমন!

আমাদের দেশে আকছার এখানে সেখানে বিউটি কনটেস্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মিস ক্যালকাটা, মিস ইণ্ডিয়া, মিস ফেমিনা ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ম্যাডাম ক্যালকাটা অথবা ম্যাডাম ঘরোয়া এ ধরণের একটা কিছু সুন্দরী প্রতিযোগিতার উদ্যোগ করলে কেমন হয়? ম্যাডাম বলতে আমি আমাদের মত বয়স্কা মহিলাদের কথা মিন করছি। আপনিও আমাদের মত। আমার প্রশ্নটা আশা করি একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

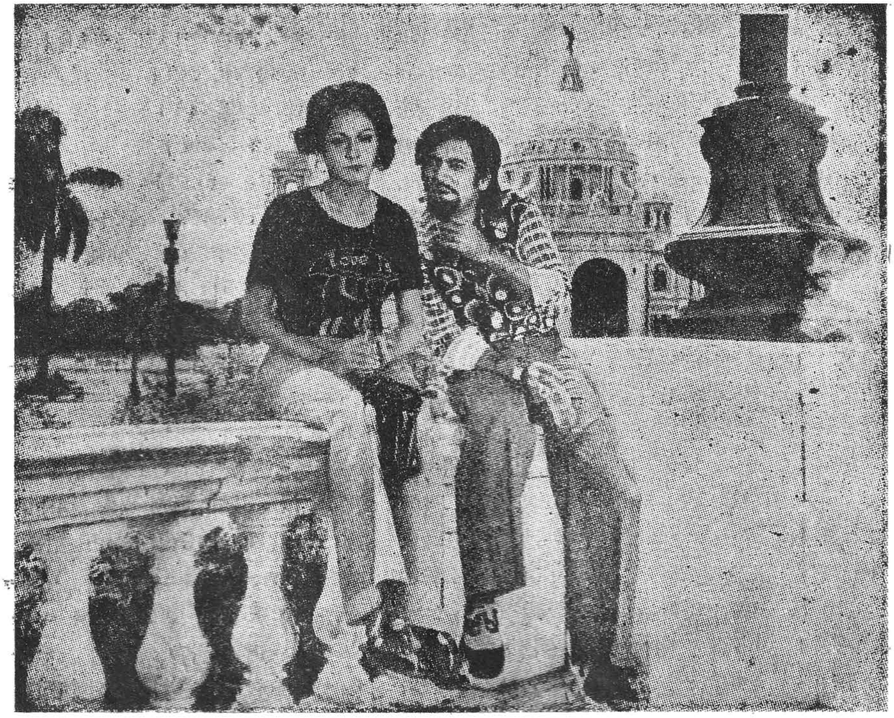
শ্রীমতী কুন্তলা বিশ্বাস ॥ কলকাতা

—সমব্যথী! আমাদেরও ব য়ে স টা অনেকদিন আগে কোকিল ডাকা দুপুরের শেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে বোধহয়। কতকগুলো রঙচঙ মেখে ফ্যাশন প্যারেড করতে যাওয়া এ বয়সে যেমন বেমানান তেমনি হাস্যকর। সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে সকলের চোখে বুড়ি কাকাতুয়া সাজিয়ে লোক হাসিয়ে লাভ কি? মনে হয় বয়সের মানানসই সাজগোজ ব্যবহার করে বয়সোপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে নিজের ব্যক্তিত্বকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরাই বুদ্ধিমতীর কাজ। ব্যক্তিত্বসম্পন্না রুচিশীলা মহিলাকে সকলেই শ্রদ্ধা করে—সেটাই তো এ বয়সে চরম পাওয়া। এটাই চেষ্টা করুন না কেন। না হলে ছোটদের চোখে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ভেবেছেন? আমরাও রঙচঙ মেখে বা অশালীন পোষাক-পরিচ্ছদ পরে সঙ সাজলে ওরাও তো তাই করবে, আদর্শ বলে কিছু থাকবে না ওদের সামনে।

বয়স আঠারো বছর। আমাদের বাড়িতে একটি ছেলে আসে। ছেলেটি গত দুবছর আগে আমার মেজ বোনকে পড়াতো। কিন্তু এখন আর পড়ায় না। ছেলেটি আবার আমাদের বাড়িওলার ছেলের বন্ধু। আমি তাকে ভালবাসি এবং সেও আমাকে। কথাটা সবাই জানে—বাবা-মা ছাড়া। গত বিজয়া দশমীর দিন থেকে মায়ের সঙ্গে ছেলেটির বিরোধ চলছে। এদিকে ছেলেটি আমায় কথা দিয়েছে, চাকরি হলেই আমার বাবা-মাকে বলে বিয়ে করবে। এখন আমার কি কর্তব্য?

তপতী চৌধুরী ॥ গোবরডাঙা

—তোমার চিঠি পড়ে মনে হয় বয়সের তুলনায় তুমি এখনও নিতান্তই ছেলেমানুষ। যাকে ভালবাস তার সঙ্গে মার মনোমালিন্য নাও থাকতে পারে। তোমার বাবা-মা'র মনোভাব বুঝে এগোনোই ভালো। মনে রেখ, সনস এও লাভার্স—ইউ কান্ট হ্যাভ বোথ।
[চিঠি দেখে মনে হয় তুমি ছেলে!]



পি কে বি ফিল্মসের
ছবি 'শুভ সংবাদ'-এ
দীপঙ্কর দে
ও
রাজশ্রী বসু

…নানারঙের দিনগুলি

(৬ পৃষ্ঠার পর)

মত দিয়েছিলেন।

শেষে বাবার কানেও কথা গিয়ে পৌঁছল। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমি ডাক্তারি পড়ি। কিন্তু সেদিকে আমার বিশেষ উৎসাহ না দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। অসন্তুষ্ট ভাবটা তখনও কাটেনি। তিনি রেগেই বলেছিলেন, ওরা যা ইচ্ছে করুক গে, আমার কাছে কেউ কিছু জিগ্যেস করতে এসো না।

শেষ পর্যন্ত আমি আবেদন পূর্ণ করে পাঠিয়ে দিলাম। যথাসময়ে ইন্টারভিউ পত্রও এসে পৌঁছল। সেন্টার কলকাতা। এই সঙ্গে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ, একটা সিন লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটা অভিনয় করে দেখাতে হবে। তাছাড়াও নিজের পছন্দমত কোন নাটকের বিশেষ একটা চরিত্র অভিনয় করে দেখাতে পারলেও চলবে।

ব্যস, আমি তো তারপর থেকে নিয়মিত ঘরের দরজা বন্ধ করে সেই দৃশ্যটা অনুশীলন করে যেতে লাগলাম। বাড়ির সবাই আমার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক। বৌদিরা আমার তামাসা দেখে তো হেসেই কুটিপাটি। মা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ছুটকা বওয়া'র হলো কি?

আমিও মাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, মা আমায় ভূতে পেয়েছে।

আমার কথা শুনে মা গালে হাত রাখলেন। চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে উঠল। মা সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

বাবা বেরিয়ে গেছেন। আমার সেই ডায়লগ আমি আরো জোরে বলতে সুরু করলাম। ম্যয় তুমকো মার ডালুঙ্গা। মার ডালুঙ্গা…পাপী। তেরে জৈসে পাপী কো মার ডালনে সে কোই গুনাহ নেহী হ্যায়। দরজা যথারীতি বন্ধ ছিল। আমার চিৎকার শুনে মা দারুণ ঘাবড়ে গেল। ছুটে এসে দরজায় করাঘাত করছেন, ওরে ছুটকা, কি হলো তোর! কি করছিস? ছুটকারে…

মা ভেবেছিলেন আমি বোধ হয় সত্যি সত্যিই কাউকে খুন করছি। তিনি দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। আমি দরজা খুলতেই মা ভিরমি খাবার যোগাড়। আমার হাতে ছোরা দেখে ভয়ার্ত হয়ে উঠলেন। ততক্ষণে ভরত (আমার ছোড়দা) ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

কি ব্যাপার মা!

ঐ দেখ! মা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

ছোড়দা তখন হেসে গড়াগড়ি। মাকে সেই তখন সব ব্যাপারটা গুছিয়ে বলল। তখন মা শান্ত হলো।

বহু আকাঙ্খিত সেই ইনটারভিউয়ের দিন এগিয়ে এল। আমি পাটনা থেকে অমৃতসর মেলে চড়লাম। একা চলেছি। মনে খুব আনন্দ আবার কখনো খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম। কিন্তু কামরায় গিয়ে বসবার পর আমার সমস্ত নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে গেল। সামনের সিটে দু'জন সুন্দরী মেয়ে বসেছিলেন। হাওড়া স্টেশনে নেমে বাইরে এলাম। রোদ্দুরে যেন সোনা ঝরছে। এমন সুন্দর সকাল বুঝি অনেকদিন দেখিনি। অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে তাকালাম। একটা ট্যাক্সি কাছে এসে দাঁড়াতে এক সর্দারজী জিগ্যেস করল, কোন হোটেলে যাবেন?

আমি তো কলকাতার একটা হোটেলেরই নাম শুনেছিলাম, মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল গ্র্যাণ্ড হোটেল।

বৈঠিয়ে সাব। ট্যাক্সী ড্রাইভার বললে। ঝড়ের বেগে ট্যাক্সী ছুটলো। কলকাতা এত বড় শহর। শুনেছিলাম, কিন্তু এত বড় ভাবতে পারিনি।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে গাড়ি এসে থামতেই আমি সার্দারজীকে ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। একজন ওয়েটার এসে আমার জিনিষপত্র তুলে নিল।

হোটেলের রিসেপশনিষ্ট রেজিস্টারটা খুলে ধরল আমার দিকে। আমি যথারীতি নাম ঠিকানা লিখলাম। তারপর এখানে আমার উদ্দেশ্যটা লিখতে গিয়ে একটু থামতে হলো। বেশ খানিকটা সময় ভেবে নিয়ে আসল উদ্দেশ্য চেপে গিয়ে লিখলাম, ভ্রমণ। সেই কথা ভাবলে এখনও আমার হাসি পায়। মনে দারুণ ভয় ছিল পুনা ইনিসটিটিউটের জন্যে ইণ্টারভিউ দিতে এসেছি, যদি উৎরাতে না পারি, তবে হোটেলের সমস্ত লোকের কাছে উপহাসের পাত্র হবো। এই ভয়ে কলকাতার আসার উদ্দেশ্যটা অন্য লিখেছিলাম। তখন কি ছাই জানি, এত বড় হোটেল, এখানে কেউ কারোর হাই-হদিশ রাখেনা। যা হোক রেজিষ্টারে সই করে তো আমার রুমে এলাম। ঘরখানা ভারি চমৎকার সাজানো গোছানো। ইণ্টারভিউ কাল। আজ সারাদিনটা হাতে রয়েছে। অফুরন্ত সময়। ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকা কোনদিনই আমার পোষায় না। স্নানপর্ব সেরেই শহর ঘুরে দেখব প্ল্যান করে বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতা সত্যিই আমায় মুগ্ধ করেছিল। হোটেলে ফেরার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসতে খেয়াল হলো কাল ইণ্টারভিউ। আর নয় এবার ফেরা যাক। হোটেলে ফিরে স্নান করে ফ্রেস হয়ে নিলাম। খাওয়া দাওয়ার পর্ব চুকিয়ে দরজা বন্ধ করে আবার রিহার্সাল সুরু করলাম। তারপর কখন যে শুয়ে পড়েছিলাম তা আর মনে নেই।

পরের দিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই ইণ্টারভিউ দেবার জন্য টালিগঞ্জের সেই ষ্টুডিও উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বহু প্রার্থী ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং একের পর একজনের নাম ডাকা হচ্ছে। শেষে আমার নাম ডাকা হলো।

শত্রুঘ্ন সিনহা, প্লীজ স্টেপ ইন।

আমি ধীরে ধীরে ফ্লোরের ভিতর ঢুকলাম। দেখলাম একটা বড় টেবিল পাতা। চারদিকে চেয়ার পাতা। পুণা ইনষ্টিটিউটের সিলেকসন বোর্ডের সদস্যরা তাতে বসে রয়েছেন। একজনের সামনে আমার আবেদন পত্রটা। তিনিই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মিস্টার সিনহা?

আজ্ঞে।

আপনি আপনার পড়াশোনা শেষ করতে চান কি?

কেন স্যর, পড়াশোনা তো চলছেই।

যদি সিলেক্ট হন, তবে?

লেখাপড়া ছেড়ে দেব।

এত বড় রিস্ক নেবেন?

আমার কাছে এটা কোন রিস্কই নয় স্যর, আমার বাড়ীর অবস্থা মোটামুটি ভাল। তাছাড়া দাদারা তো সবাই ওয়েল প্রেসড্। আমার আর্টের ওপর বিশেষ ফ্যাসিনেশান। ইণ্টারেস্টও কম নয়।

ওয়েল, আমাদের পাঠানো পার্টটা আপনি মুখস্ত করেছেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর।

প্লিজ গেট রেডি।

আমি রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিলাম। তারপর সেই মার্ডার সিনটা অভিনয় করতে শুরু করে দিলাম। সামনে একজন ডামি ছিল, তাকেই খুন করতে উদ্যত হলাম। মুখে একটা দারুণ প্রতিহিংসার ভাব ফুটিয়ে তুললাম। এই অভিনয়ের ফাঁকে ইনষ্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মুখখানা দেখে নিতে ভুললাম না। তিনি অভিভূত বুঝতে পেরে আমার উৎসাহ আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তারপর একসময় অভিনয় শেষ হলো।

ওয়েল ডান মাই বয়। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আমায় কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে বললেন। তারপর আমার স্ক্রীন টেস্ট নেওয়া হলো। তাতেও আমি উতরে গেলাম। আমি সিলেকটেড হলাম।

পাটনা ফিরে গিয়ে কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে পরের সপ্তাহেই পুণা রওনা হলাম।

পুণায় প্রথম প্রথম ছেলেরা আমায় নিয়ে ভীষণ ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। কিছুদিন পরে আমিও নতুন ছাত্রদের নিয়ে একটা দল তৈরী করে ফেললাম। তারপর তারা খানিকটা নিরস্ত হয়েছিল।

প্রথম থেকে পুণায় যে আমার একেবারে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হয়ে উঠেছিল তার নাম অনিল ধাওয়ান। বম্বে ফিরে এসে

সে আজও আমার তেমনি বন্ধু আছে।

পুণায় এসে আমার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজে দেখে আমি হতবাক হয়েছিলাম।

ছুটিতে পাটনায় এসেছি। বন্ধু বান্ধবেরা তো আমায় দেখে অবাক। একজন বলেই ফেললে, কিউ বে সালে, এ কেইসি ঢঙ লাগা রাখ্যা।

তোর ভগ্নিপতি হয়েছি যে...

ফিল্ম অ্যাকটর হবি?

দেখবি নিশ্চয়ই হবো—

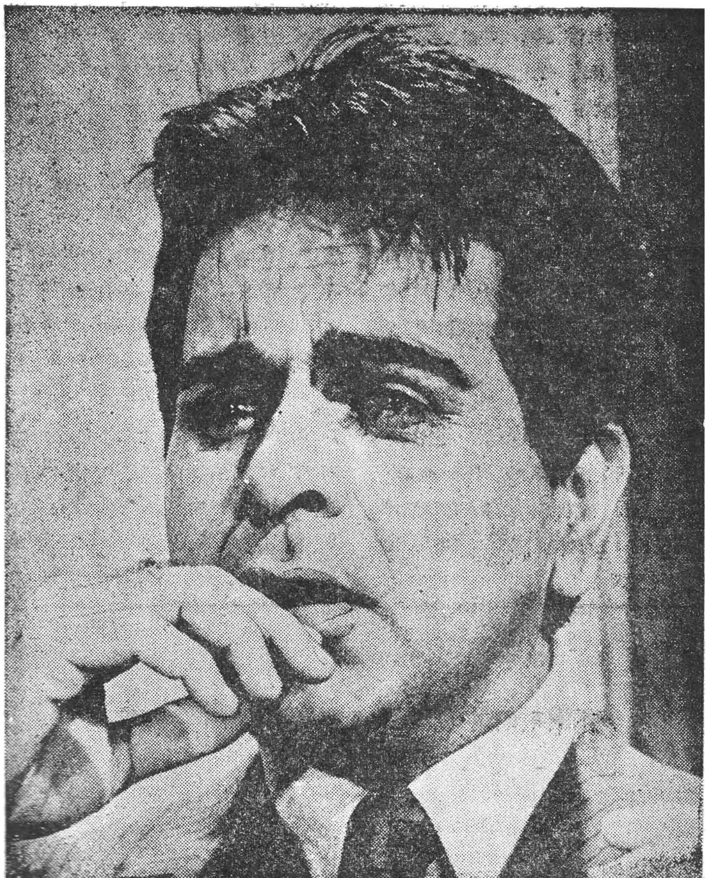
কচু হবি। নিজের চেহারাখানা একবার দেখেছিস।

বন্ধুদের এমনি কথায় আমায় আরও জেদ চেপে গেল।

বন্ধুদের কটাক্ষে আমার অভিনেতা হবার বাসনা আরও তীব্র হয়ে উঠলো। পুনা যাবার আগে বিহারের কয়েকটা ফিল্ম কোম্পানীতে আমি অবশ্য একটু চেষ্টা করলেই ঢুকে পড়তে পারতাম গঙ্গা মাইয়া তেরে পিয়ারী চড়াইবু ছবির অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে পাটনায় রাতারাতি কয়েকটা ফিল্ম কোম্পানী গজিয়ে উঠেছিল। কোন একটা কোম্পানী তো কুশবালুকাণ্ডের 'লাল-রেখা' উপন্যাসটির চিত্রসত্ত্বও কিনে ফেলেছিল। কিন্তু আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ফিল্ম কোম্পানীগুলির ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার।

আমার আশঙ্কা কিন্তু অমূলক হয় নি। একে একে পাটনার সবকটা ফিল্ম কোম্পানী লালবাতি জ্বালল। ফলে বম্বের চিত্র প্রযোজকেরাও প্রমাদ গণেছিলেন। ভোজপুরী ছবি তৈরির কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

আমার বন্ধুরা এ ব্যাপার দেখে দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। আমাকে মাঝে মাঝেই বলত, বিহার থেকে ফিল্ম হিরোর চান্স পাওয়ার খুব শক্ত। তোর খাটুনিই সার হবে। মাঝখান থেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বসলি।



'চন্দ্রগুপ্ত ও চানক্য' ছবির স্যুটিং এই মাসের শেষে সুরু হচ্ছে। দিলীপকুমার চানক্যের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

তোদের ধারণা ভুল, সেটা আমি প্রমাণ করে ছাড়ব। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। ফণীশ্বর নাথ রেণু সাহিত্যে প্রচুর সম্মান পেয়েছেন, ফুটবলে সামাদ, মেওয়ালাল, সি প্রসাদ ও চন্দন গুপ্তা এই বিহারের সন্তান। আমি অত উঁচু সম্মান চাই না, তবে দেখে নিস আমিও একদিন বম্বে চিত্র জগতের আকাশে উজ্জ্বল এক তারকা হবই। আমি বললাম। আমার বন্ধুরা আমার কথায় বোধহয় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। বললো শন্নো (বন্ধুরা আমায় এই নামেই ডাকতো) আমরা সবাই মনে মনে প্রার্থনা করি তুই যেন বিহারের নাম রাখিস।

গুরুজনদের প্রণাম করে আবার আমি একদিন পুনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমার ছুটি শেষ। আবার সেই ইনষ্টিটিউটের একঘেয়ে জীবন।

ট্রেন ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে। আমার পাটনার বন্ধুদের কথা, বাড়ির কথা, মা-র কথা এই মুহূর্তে স্মৃতিগুলো একে একে যেন মানসপটে ভেসে উঠল, অকারণেই মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। বাবার কথা মনে পড়তেই আমি বিমূঢ় বিহ্বল হলাম। ভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহকে পাটনায় কে না চেনে। বাবার স্বভাব আসলে খুব নরম ছিল, মানুষের কোন উপকার করার সুযোগ পেলে তিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে

তা করতে পেছ-পা হতেন না। স্বভা-বতই বাবাকে সবাই শ্রদ্ধা ভক্তি করতো। আমরা চার ভাই, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। বুঝতেই পারছেন আমি ছোট ছেলে অতএব আমার দারুণ অ্যাডভান-টেজ। আমার ওপরই সবার স্নেহ মমতা একটু বেশি ছিল। বাবাও আমায় কম স্নেহ করতেন না। দিদিমার মুখে শুনেছি, আমি নাকি পরিবারের সৌভাগ্যের কারণ, আমার জন্মের পরেই নাকি চাকুরি ক্ষেত্রে বাবার বেশ বড় রকমের উন্নতি হয়। তিনি বিহার সরকারের স্বাস্থ্য ও শারিরীক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের আচার্য পদ লাভ করেন। আমার জন্ম হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ৯ ডিসেম্বর। বিশ্বমহাযুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন পরে।

ছোট বেলায় আমি ভীষণ জেদী ছিলাম আর দুষ্টুমীতে আমার জুড়ি ছিলো না। পাটনা কলিজিয়টে স্কুলের শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করলেই সম্যক পরিচয় পাওয়া যেত। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কেউ কেউ এখনও আমার নাম শুনলে আঁতকে উঠবেন।

তখন আমি ক্লাস সিকসে পড়ি, নিত্য নতুন অভিযোগে আর নালিশে শিক্ষকেরা এবং অভিবাবকেরা সবাই অতিষ্ট হয়ে উঠেছেন। শাস্তিভোগও কম করিনি, হলে হবে কি কথায় আছেনা, স্বভাব যায় না মলে আর ইল্লত যায় না ধুলে আমার অবস্থাও তাই আর কি, কোন কিছুতেই আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। সহপাঠীদের ব্যাগ ছিঁড়ে দিতাম, জামা প্যাণ্ট খুলে দিতাম, এমন কি কখনও কাউকে প্রহার করতে বাঁধতো না আমার।

সবচেয়ে মজার কথা হলো, যারা প্রথম প্রথম আমার নামে নালিশ করেছে, তারাই পরবর্তীকালে আমার ভীষণ ভক্ত হয়ে উঠেছিল। আমি তাদের লীডার বনে গেলাম। ওরা সবাই আমাকে কিন্তু যমের মত ভয়ও করত।

আমি যে খুব স্বাস্থ্যবান ছিলাম বা আমার গায়ে প্রচুর শক্তি ছিল তা নয়, আসলে ছিল দারুণ সাহস ও মনের জোর। ওদের মধ্যে কেউ যদি কোনদিন সাহস করে আমায় ধোলাই দিয়ে দিত, তাহলে কিন্তু আমার স্বরূপ প্রকাশ যেত।

ওরা ভয় করত অন্য কারণে, আমার দাদারা এই স্কুলেই পড়তেন। অবশ্য অনেক উঁচু ক্লাসে, আমরা চার ভাই যদি একত্রে দাঁড়াই তবে আমাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা কারোর পক্ষেই সম্ভব হতো না।

(চলবে)

স্মিতা/বিনোদ

(তেত্রিশ পৃষ্ঠার পর)

রাজনীশের আশ্রমে কতোজন গরিব আছে, তা বোধহয় কোনোদিনই জানা যাবে না, যদি না আপনি পাচক বেয়ারা ইত্যাদির হিসেব ধরেন। বোম্বের চলচ্চিত্র এলাকায় রাজনীশের চেলার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

অভস্র কালো টাকা, এবং রাজনীশের মতো নক্ষত্রলোকের অর্গাজম, দুয়ে মিলে একেবারে চন্দন সৌরভ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। গোলডিই প্রথম রাজনীশ মহিমা প্রচার করে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে—ম্যয় ভাইঝিকে বিয়ে করা শুদ্ধ!

স্মিতা, এমনিতেই আঁতেল, কাজেই রাজনীশের মতো আমেরিকা ফেরত তান্ত্রিক তাকে আর কিছু হোক না হোক নিজস্ব পথে রাগ মোচনের কায়দাটা শিখিয়ে দেবে। আর বিনোদ? না বললেও ধরে নিতে কষ্ট হবে না আপনাদের!

কৌশিক রায়

সওয়াল জবাব

সুদেশ চন্দর

সত্যেন চৌধুরী (কলকাতা)
শুনছি মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে রঞ্জিতার খুব লম্ভ অ্যাফেয়ার ইত্যাদি চলছে ?
—আই সি, কোন কাগজে পড়েছেন ? না জ্যোতিষশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় হয়ে হাত গুনে বার করে ফেলেছেন ? জবাব নেই আপনার ইমাজিনেশানের।

রমেশ চন্দ্র সামন্ত (মেদিনীপুর)
অশ্লীলতা কাকে বলে ? অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা কি ?
—একটি সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়ের ছবি হলো আর্ট, কিন্তু মেয়েটির যদি ব্রা আর জুতো পরা থাকে তবে সে ছবি হবে অশ্লীল। যে কোন শিল্পকর্মের আবেদন যদি নোংরা হয় তবে তাকে অশ্লীল বলা হয়ে থাকে। তবে বিচার করা খুব শক্ত। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি তো কোন ছাড়, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ মন্ত্রী-টন্ত্রীরাও বোধহয় ঢোঁক গিলবেন। ঠিক ঠিক সংজ্ঞা বোঝাতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

বিজন দত্তগুপ্ত (কলকাতা)
একটা কৌতুকি দিন।
—বিজন আর শর্মিলা বসে আছে। এত মুখচোরা যে দুঘণ্টা কেটে গেল একটা কথা বলেনি। শর্মিলা একেবারে বোরড হয়ে গেছে।
শর্মিলা : আচ্ছা বিজুদা, তুমি যদি অনেক টাকা পাও তাহলে কি করবে ?
বিজন উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আমি ? আমি কখোনই বাড়িতে বসে থাকবো না। আমি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ব। পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে যাবো।
সঙ্গে সঙ্গে বিজনের হাতে শর্মিলার নরম হাত যেন কিছু দিল। মুখ তুলতেই বিজন দেখল শর্মিলা চলে গেছে আর ওর হাতে চকচকে আধুলি। বাস ভাড়া দিয়ে দিয়েছে শর্মিলা। অগত্যা বাড়ি ছেড়ে বেরোতেই হলো বিজনকে।

শক্তি সামন্ত পরিচালিত 'খোয়াব' ছবিতে রঞ্জিতা ও মিঠুন চক্রবর্তী





বি, সি, দেবরা ফিল্মসের 'বণ্ড ৩০৩' ছবির একটি দৃশ্যে জীতেন্দ্র ও পরভীন বাবী, পরিচালক রবি ট্যাণ্ডন, সুর রাহুল দেববর্মন

রীতা সান্ন্যাল (খড়্গপুর)
শক্তি সামন্তের খোয়াব ছবির নায়ক-নায়িকা কে ?
যতদূর মনে পড়ছে মিঠুন চক্রবর্তী ও রঞ্জিতা।

সুভাষবসু মল্লিক (দুর্গাপুর)
একটা জোক দিন।
নতুন এক ভদ্রলোক শহরে এসেছেন। খিদে পাওয়ায় এক রেস্তরায় খেতে বসেছেন। বয় বলল, আপনি নতুন বুঝি ?
ভদ্রলোক : হ্যাঁ।
বয় : তা হলে এ শহরের সব কিছু আমার কাছে জেনে নিন। ঐ যে মেয়েটা দেখছেন, তার এক রাতের জন্য রেট মাত্র কুড়ি টাকা। আর ওদিকে যে লাল শাড়ি পড়া, তার পঞ্চাশ টাকা, আর ডান দিকের টেবিলে যে দুজন রয়েছে, তাদের পঁচিশ টাকা করে। আর এইমাত্র বেলবটস পরা মেয়েটি যে ঢুকলো, তার চল্লিশ টাকা।
ভদ্রলোক : (চমকে) সে কি ! এ শহরে কি ভদ্রঘরের ভাল মেয়েছেলে নেই ?
বয় : (দুঃখের সঙ্গে) থাকবে না কেন স্যর ! এ শহর কি এতই ফেলনা ভেবেছেন ? ভদ্রঘরের ভালো মেয়ে অনেক আছে, তবে তাদের রেট একটু বেশি। একশ টাকার নীচে কেউ ফিরে তাকাবে না।
ভদ্রলোকের মুখটা প্যাচার মত খ্যাঁচা হয়ে গেল।

সন্ধ্যাশ্রী দত্ত (কলকাতা)
শত্রুঘ্ন সিনহার ঠিকানাটা একটু দিতে পারেন ?
—একটু কেন ? সম্পূর্ণটা নিন, শত্রুঘ্ন সিনহা, ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড, বান্দ্রা, বম্বে-৫০
ওর হাতে এখন কটা ছবি ?
—সাইন করা আছে গোটা বারো ছবি। এখন ছ'টা ছবিতে রেগুলার ডেট দিয়ে কাজ করছে।

অসীমকুমার (জলপাইগুড়ি)
মনে রাখবার মত একটা কোটেশান দেবেন ?
—সিওর লিখে নিন :

A man gets and forgets
Women gives and forgives

অনুপম ঘোষাল (তিনসুকিয়া)
একটি দারুণ কৌতুকী ছাড়ুন না ?
—মলয় ঘোষ সদ্য বিয়ে করে ফিরেছে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান শহর থেকে। বোম্বে শহরে প্রচুর দোকান পাট, বিশেষতঃ শাড়ির দোকান। নতুন বৌ

যাতে যখন তখন বাজারে বেরিয়ে শাড়ি চাড়ি বেশি না কেনে সে জন্য মলয় বৌকে বোম্বেতে একা মেয়েদের বেরোন যে কত ডেঞ্জারাস সে সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প ফেঁদে বলে ফেলল।

মলয়ঃ বোম্বেতে একা মেয়ে বেরোলেই কেলেংকারী। ছেলেরা এখানে মেয়েদের পেছনে হাত দিয়ে টুকুস করে চিমটি কেটে দেয়।

নববধূঃ ওমা কি অসভ্যতা, সত্যি?

মলয়ঃ হ্যাঁগো. বড্ডো পশ্চিমী ধাচের শহর তো। ইতালীয়ানদের মত এই বদ অভ্যাস রপ্ত করেছে এখানকার বখাটে ছেলেরা। পেছন ফিরে দোকান পাট দেখছো হয়তো এমন সময় তোমার পাছায় কেউ এক রাম চিমটি কেটে দিল। আর যা তরমুজের মত একটা পেছন বানিয়েছ না, তুমি একা বেরোলে আর রক্ষে নেই।

নববধূঃ বাপরে; আমি বাপু বেরোচ্ছিনা একা।

বউ-এর কথা শুনে মলয়বাবু দারুণ খুশি, নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে ভাবল, এমন বানিয়ে বলা গল্পটা বউ বিশ্বাস করেছে এবং সে নিশ্চিন্ত হলো।

একদিন মলয় কোলাবা দিয়ে ফিরছিল অফিস থেকে। হঠাৎ তার নজর গিয়ে পড়ল একটা বিরাট ডিপার্টমেন্টাল শপ-এর শোরুম-এর দিকে, লক্ষ্য করে দেখল; হ্যাঁ যা ভেবেছে তাই তো শাড়ির শো কেসের সামনে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী শাড়ি জামা দেখছে গম্ভীর ভাবে। এই বার মলয় মনে করল, তার প্ল্যান তো ফেল করেছে। নিজের কথার যথার্থতা প্রমাণ করতে এবং সত্যতা রাখতে সে ভাবলো বৌ-এর কাছে এভাবে ছোট হবে? হরগিস নেহি। মলয় এগিয়ে গেল বউ-এর কাছে, ভাবলো সে তার পিছনে চিমটি কেটে শট করে সরে যাবে। বৌ তাহলে আর নির্ঘাৎ বাড়ি থেকে বেরোবে না। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। কোন দিকে না তাকিয়ে সে তার স্ত্রীর পেছনে চিমটি কেটে দিল। মেয়েটি প্রচণ্ড রাগে ঘুরে দাঁড়াতেই মলয় চোখে চরকগাছ দেখল. এ মেয়েটিতো তার স্ত্রী নয়, অন্য কেউ। মলয় তখন মরীয়া হয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটিও তেমনি নাছোড়বান্দা। লোকজন ডেকে একাকার করে মলয়কে রামধোলাই খাওয়াল। দেখলেন তো অতি চালাকের গলায় দড়ি। মনে রাখবেন মলয়বাবুর মত মহাশংকটজনক পরিস্থিতিতে পড়বেন না যেন!

প্রকাশ মেহরা পরিচালিত 'জাওলামুখী' ছবির এক অন্তরঙ্গ দৃশ্যে শাবানা আজমী ও শত্রুঘ্ন সিনহা।



চারু মজুমদার বেঁচে থাকলে নির্ঘাৎ আত্মহত্যা করতেন যদি শুনতেন মিঠুন চক্রবর্তীও এককালে সক্রিয় নকশাল ছিলো! বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, মিঠুন বোম্বের কাগজঅলাদের বলে বেড়াচ্ছে সে নাকি এ্যাকটিভ নকশালাইট হিসেবে বোম্বেতে এসেছিলো আত্মগোপন করতে!

(বাংলায় বাঞ্চ…হিসেবে একটা কথা আছে, যা বিশেষণ হিসেবে বেশ ভাব প্রকাশক, এবং মিঠুন—'ড্যাস' (বললে বোধহয় খারাপ হোতো না!) তা এককালের এই নকশাল ছোকরার বেশ ভালোই আছে। গতবারেই আপনাদের জানিয়েছি যে ৫০ নং ছবিতে সই করেছে, এবং এর মধ্যেই একটা জাঁদরেল ফ্ল্যাট, তিনটে গাড়ি (একটি মার্সিডিজ), সেক্রেটারি ও অন্তত এক ডজন খাপ সুরৎ ছুঁড়িকে বাড়ির মধ্যেই রেখে দিয়েছে, যারা মিঠুন ব ল লে ই হোলো…সঙ্গে সঙ্গে…'ওই'টা করে বসবে!

রঞ্জিতার সঙ্গে ফ্রি সেকস টেকস মিথুন কতটা করেছে, জানা যায় না, তবে একটা ছবির সুটিং-এ দুজনে এ্যায়সা লাগতাই চুমু খেয়েছে যে মনে হবে হোম ওঅর্কটা বেশ ভালোই হয়েছে। অন্যদিকে, যোগিতা WombService দিতে কতটা তৈরি তা ঠিক ভাবে জানা না গেলেও, মানে এসব ব্যাপার জানা বড়ডো শক্ত, এটুকু জানা যাচ্ছে মিঠুন যোগিতার মৈথুন প্রতিযোগিতা হস্তসীমানা পার হয়ে হস্তিনী-ছকে ঢুকে পড়েছে!

সেলিম-বিনোদ
(২০ পৃষ্ঠার পর)

বলেছে:
আমি মিঠুনের বন্ধু। আমাদের মধ্যে খুব মেলামেশা আছে। তার মানে কী এই যে আমি মিঠুনেরও প্রেমে পড়েছি? প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায় এই লাইনে বিন্দিয়ার প্রথম প্রেমিক বিজয় অরোরা। বিজয়ের সঙ্গে হঠাৎ একটা 'কেচ্ছা' হওয়ার পরই বিজয়কে আর বিন্দিয়ার সঙ্গে দেখা যায় না।

বিজয়ের কথা তুললেই বিন্দিয়া ক্ষেপে যায়।

সেলিম, বিনোদ?

হ্যাঁ! দু জনের সঙ্গে কী এক সঙ্গে প্রেম করা যায়?

উড়ো খৈ

শ্রীগোবিন্দ

রাজকুমারকে মনে আছে? ব্যাটা এবার উলফৎ নামে একটি বই লিখছে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেটের কোর্টে অপেক্ষা করতে করতে। সাধনা ওয়াহিদাকে নিয়ে উললুক—না উলফৎ ছবি করবে বলেও ইচ্ছে আছে রাজুর।

রাজেশ খান্নার কপালটা বোধহয় এবার ভালোর দিকে যাচ্ছে। গত কয়েক মাস ধরে রাজেশ অনেকগুলো ছবিতে দারুণ ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাঝে কনজাংটিভাইটিজ হওয়ায় বেশ কিছু পরিচালক একেবারে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলো। রাজেশের বিখ্যাত বউ ডিম্পলও লাল চোখ নিয়ে বেশ কিছুকাল ভুগলো।

দেব মুকুজ্যে এবার একটা গোলমাল করবেই। তুলসী তেরে অঙ্গন মে'র পর থেকে দেবু একটু পুনর্জীবিত হয়েছে। কাজল কিরণকে হিরোইন বানিয়ে সে এবার 'কারাটে' নামে একটি ছবি করছে। মিঠুন আর দেবু একসঙ্গে কারাটে চপ-কাটলেটের ট্রেনিং নিচ্ছে। কাজলকে শেষ অবধি 'মাটন চপ' কে দেবে—তা নিয়ে ভাবা যেতে পারে!

দিলীপকুমারকে আজকাল খুব ঘুড়ি ওড়াতে দেখা যাচ্ছে বারান্দা থেকে!

রাজেন্দর বেদির ডান হাত প্যারালাইজড হয়ে গেছে, এবং ছেলে নরেন্দ্র বেদির সঙ্গে এতোকালের ঝগড়ার অ ব সা ন হয়েছে। পরের ছবি: পিতা পুত্র বান্ধবী?

দীনার ছবি দেখলে, এমন কি দীনার কথা শুনলেও নাকি লোকের 'কান' খাড়া হয়ে যায় (কান? 'ওটা'কেই আমরা আজকাল 'কান' বলি, নইলে খাড়া করানো সম্ভব হয় না!) সিপির আশ্বাস ছবিতে দীনা নাকি কান খাড়া করার মতো অনেককিছু, যাকে বলে, হট সিন সিনারি দিয়েছে—পারভেজের সঙ্গে। খবর হচ্ছে, মা-কালী সেজে মেয়েটা এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে এমন এক জায়গায় আশ্রয় চাইছে যেথানে বিকিনি-টিকিনি পরতে হবে না।

সাত মিনিট

আর্ভিং ওয়ালেস



অনুবাদ
ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

(দুই)

[প্যারিসে, অনেকদিন আগে লুকিয়ে ছাপা 'সেভেন মিনিটস' নামে একটি মারাত্মক আদি রসের বই নিষিদ্ধ হয়ে যায় নানা দেশে। হঠাৎ, স্যানফোর্ড হাউস প্রকাশনা থেকে বইটি আমেরিকায় প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি হতে শুরু করে। বইটির জনৈক বিক্রেতা ফ্রিমস্টকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে অশ্লীল বই বিক্রীর অপরাধে। মাইক ব্যারেট সাহিত্য রসিক ও পণ্ডিত উকিল সেই সময় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো।]

মনে হোলো রাতারাতি ধোঁয়াশা কেটে- রামধনু-রঙ পার হয়ে অজস্র আশা ডানা মেলছে। আর আশা ক্রমশই জমাট সোনার তাল হয়ে উঠছে। আশা পাওয়া গেলো জেলকিনের কাছ থেকেই। জেলকিন জানালো সিভিল লিবার্টি ইউনিয়ন-এর চাকরি ছেড়ে সে লস এ্যানজেল সে নিজের অফিস খুলছে। মক্কেল নিশ্চয়ই আসবে। যাবতীয় অবিচার, অমানবিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার সন্ত্রাসকে চ্যালেনজ জানাতে সক্ষম হবে সে। এবং এই ধরণের আইন-ব্যবসার জন্যে ব্যারেটকে সে অংশীদার হিসেবে পেতে চায়। এতে হয়তো পকেট ভর্তি হবে না, কিন্তু জীবন সমৃদ্ধ হবে।

প্রস্তাবটা পেয়ে ব্যারেট উত্তেজিত হয়ে উঠলো। আবার নতুন করে বাঁচবার একটা আশা, প্রত্যেকটা দিন অর্থময় করে তোলার প্রত্যাশা সম্ভব হবে। স্বাধীন হতে পারবে। বেঁচে থাকতে পারবে। সবকিছু পাওয়া যাবে, শুধু পাওয়া যাবে না টাকা, ধনদৌলত যা অনূদিত হয় শক্তি হিসেবে।

তবুও ব্যারেট আগ্রহী হোলো। তবে, দ্বিধাটা পুরোপুরি কাটাতে পারলো না। একটু ভেবে দেখা দরকার। জেলকিন ও ব্যারেট আদর্শবাদে বিশেষজ্ঞ। ব্যারেট জেলকিনকে জানিয়ে দিলো, রাজি।

ঠিক হপ্তা চারেক পরেই আর একটা ব্যাপার আচমকা ঘটে গেলো, তা হোলো ওসবোর্ণের সঙ্গে যোগাযোগ।

ব্যারেট ওর বাসার কাছে এসে পৌছলো। গাড়ি থেকে নামতে নামতে

কবজি ঘড়ির দিকে তাকালো। এক ঘণ্টা পর জেলকিনের সঙ্গে দেখা হবে। কাজেই চান-টান করে একটু ঝরঝরে হওয়া যেতে পারে।

একটু ঝুঁকে গাড়ির ভেতর থেকে সে ছ' তলা বাড়িটার লিফটের দিকে এগোলো।

জানালা বন্ধ ছিলো বলেই ঘরটা বোধহয় ঠাণ্ডা। ঠিক নিজের বলে মনে হোলো না ঘরটাকে। যে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে সব কিছু। বড়োলোকের মেয়েদের মতোই ফের হাতে সময় অজস্র। তার ওপর আবার ডেকরেসন সম্বন্ধে পড়াশোনার একটা ব্যাপারও আছে। ব্যারেটের ঘরে ঢুকে চিলে ঢালা সোফা দেখে প্রথমে তো শিউরে উঠেছিলো সে। হঠাৎ, একদিন সেই সোফাটাকে বদলে ছিলো সে উটের পিঠের মতো করে। তারপর এক এক করে দেওয়ালে শনের দড়ি পাকানো নকশা, ভিকটোরিয়ান রোলটপ ডেসক, ফরাসী কায়দার বেতের চেয়ার—সবই কেমন যেন সুন্দর করে সাজিয়ে দিলো।

লবি থেকে টেলিফোন এলো।

মিষ্টার ব্যারেট? ন্যুইঅর্কের ফিলিপ স্ট্যানফোর্ড আপনাকে দুবার ফোন করেছেন। লং ডিসট্যানস কল। খুব জরুরি।

ও। ব্যারেট জানালো, ঠিক আছে। আর একবার কানেকট করে দাও।

ফিল স্ট্যানফোর্ডের কথা তার পুরোপুরি মনে পড়ে গেলো। দু'বার ফোন করলো, ব্যাপারটা কী? প্রত্যেক বছরেই ফিল বার কয়েক ফোন করে, বেশির ভাগই সন্ধ্যেবেলায়। ফিলের কপালটা বেজায় খারাপ। উত্তাপহীন বউ আর কড়া বাবা। কিন্তু, এই সাত সকালে দু'বার ফোন? ব্যারেট ভাববার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা কি হতে পারে। হার্ভাডের পড়া শোনা চুকিয়ে ফিল ন্যুইঅর্কে চলে গিয়েছিলো। বাপের বিখ্যাত প্রকাশনায় সম্পাদকের কাজ পেয়েছিলো একটা। তারপর এক সময় বিয়ে করে ফেললো। বিয়ের পরও ব্যারেটের সঙ্গে ফিলের যোগাযোগ ছিলো। এক রেস্তরাঁয় খানা পিনা করতো সপ্তাহের শেষে। তারপর, 'ক্যালিফোর্নিয়াতে চলে আসার পর,' ব্যারেটের সঙ্গে ফিলের দেখা হয়েছিলো বার ছয়েক। বউ ছেলের কথা বলতে গিয়ে বলতো, স্ট্যানফোর্ড হাউসে পুরো ক্রীতদাস হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে।

মাস তিনেক আগে ব্যারেট একটা কাজে ন্যুইঅর্কে যেতে ফিলের সঙ্গে দেখা হয়। এবারে ফিলকে একটু সুখী মনে হয়েছিলো, এবার নাকি নিজের ক্ষমতা দেখাবার, নিজের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ পেয়েছে সে।

ওয়েসলি আর স্ট্যানফোর্ড, আমেরিকান প্রকাশনা জগতে প্রায় দৈত্য বিশেষ, মারাত্মক এক স্ট্রোকে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন। কোনো রকম কাজ কর্ম হাতে নিতে ডাক্তার বারণ করে দিয়েছেন। ফলে, স্ট্যানফোর্ড প্রকাশনায়, যার বই নোবেল, পুলিৎসার, প্রী গঁকুর পেয়েছে গণ্ডায় গণ্ডায়, এখন ছাদহীন বাড়ির অবস্থা। বিখ্যাত এই বাবা ফিল স্ট্যানফোর্ডকে চিরকালই অকেজো মনে করে প্রচুর উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। কাজ দেখাবার এতোটুকু সুযোগ অবধি দেন নি। ভদ্রলোক ছেলেকে অক্ষম নির্বীজ বলে নিজেই মনে করেন নি শুধু, ছেলের বউকেও ঠিক সেইভাবে চিন্তা করতে শিখিয়ে দিয়েছেন।

ওয়েসলি শয্যাশায়ী হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবসায়ীরা দল বেঁধে এলো প্রকাশনা সংস্থা কেনার জন্যে। ওয়েসলি হয়তো বিক্রি করতেনও, কিন্তু ফিল সেইসময় বাপের কাছে গিয়ে একটি সুযোগ ভিক্ষে চাইলো। অসুস্থ বলেই হোক, অথবা ছেলে কৃপা-প্রার্থী হয়ে আসবে একদিন এই অপেক্ষাতে থেকেই হোক, ওয়েসলি সাহেব কর্কশ গলায় ছেলেকে জানালেন: আবেদন মঞ্জুর। ফিলকে দু'বছর সময় দেওয়া হোলো প্রকাশক হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার। এই সময়ের মধ্যে যদি সে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার চাকরি তো যাবেই এবং প্রকাশ সংস্থাটি বিক্রি করে দেওয়া হবে ব্যবসায়ীদের কাছে।

প্রথম বছরেই ফিলের কুড়িটা বই বেঘোরে 'মার' খেলো। দু'একটা বই সামান্য লাভ করলো। অতএব, ফিল ঠিক করে নিলো, বাপ কী প্রকাশ করতো না করতো ভেবে, এবার নিজে সে যেটা ভালো বুঝবে তাই করবে। লিহাভর থেকে ন্যুইঅর্ক আসার সময় একটা বই তার হাতে এসেছিলো। বইটি এ-যাবৎ ইংরিজি বলা কোনো দেশে প্রকাশিত হওয়ার অনুমতি পায় নি। বইটির নাম 'সাত মিনিট'। আর এই বইটির ওপরই ফিল তার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি সমর্পন করে দিলো।

ব্যারেটকে সব জানিয়ে ছিলো সে। বলেছিলো, আধুনিক আবহাওয়ার এই বইটা খুবই উপযোগী। লেডি চ্যাটারলিজ লাভার ও ফ্যানি হিল যখন পশ্চিমী দুনিয়া অবশেষে মেনে নিয়েছে, 'সাত মিনিট' মেনে নেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা তাদের নিশ্চয়ই এসে গেছে। বইটা ছাপতে গেছে, এবং বেরোলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে। বইটির ব্যবসায়িক সাফল্যের ওপর ফিলের ভবিষ্যৎ-ও নির্ভর করছে।

আলোচনা একটু থামতে, নিজের, খবর বলতে গিয়ে, ব্যারেট বন্ধুকে জানিয়েছিলো সে সম্প্রতি উইলার্ড ওসবোর্ণের মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে ও জেলকিনের সঙ্গে আইন ব্যবসায়ে নামার চেষ্টায় আছে।

টেলিফোনের আওয়াজটা আসতে ব্যারেট উঠে দাঁড়ালো।

মাইক?

উঁ। কী ব্যাপার—হঠাৎ এমন জরুরি তলব?

মাইক, তোকে খুব দরকার—

ফিলের গলা শুনে মনে হোলো সে ভীষণ বিপদে পড়েছে।

কী হয়েছে ?

আমার সেই বইটা, তোকে বলেছিলাম —সাত মিনিট—জে জে জাডওয়ে—

মনে পড়েছে। পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে যে বইটা কেউ বের করতে সাহস করে নি। আমি বিজ্ঞাপনটাও পড়েছি গত রোববার। দারুণ হবে।

তুই কী বইটা পাস নি ? আমি তিন সপ্তাহ আগে তোকে এক কপি পাঠিয়েছিলাম।

একটু অপরাধী হয়ে বইয়ের তাকটার দিকে তাকালো ব্যারেট। এখনো বইটার প্যাক খোলা হয় নি। অনেক গুলো কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্যে বইটা পড়া হয় নি। সে তাড়াতাড়ি জবাব দিলো : বইটা পেয়েছি। এক ঝলক দেখেছি কিন্তু হাজার ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ার জন্যে বইটা এখনো পড়া হয় নি। যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হোলো খুব ভালো চলবে—

চলবে। নিশ্চয়ই চলবে। ফিল উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলো : এই বছরের একমাত্র বেস্ট সেলার হবে বইটা, তুই দেখে নিস ! এই বছরের কেন, এই যুগের ! এখনো বইটা ঠিক মতো ছাড়া হয় নি, কিন্তু এর মধ্যেই যা অর্ডার এসেছে—তাতে আবার ছাপতে হবে। তিরিশ হাজারের বেশি বই বেরিয়ে গেছে এর মধ্যে। নিষিদ্ধ বই অশ্লীল নোংরা—সব রকম আলোচনা চলছে। আরও চার লাখ বই ছাপাতে হবে কয়েক মাসের মধ্যে। তারপর পেপার ব্যাক্ সংস্করণ আছে—লেডি চ্যাটারলিজ লাভার সাত লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিলো —'সাত মিনিট' তার চেয়ে বেশি বিক্রি হবে—ওয়েসলি আর'কে এবার দেখিয়ে দেবো (ফিল সব সময় বাবার নাম ধরে ডাকতো)—

সবাই বুঝতে পারছি। তোর জিৎ হবে।

জিৎ হবে—যদি—

'যদি' ? ব্যাপারটা কী ?

সেনসর ! পুলিশ যদি হামলা করে তাহলে একটা বইও বিক্রি হবে না আর। বাপ আমাকে কান মুলে বের করে দেবে। বেটি লাথি দেখাবে। আমাকে না খেয়ে মরতে হবে—

ব্যারেট এবার বিরক্ত হোলো, ফিল আসল কথাটা এখনো বলছে না। তবুও সে জবাব দিলো :

তোর এতো ঘাবড়াবার কী আছে ? সেনসর ? এখন সময়টা অনেক বদলে গেছে। রানিরও ঠ্যাঙ আছে—সবাই জেনে গেছে এটা, রানির ঠ্যাঙ যে আরো লোভনীয়—এটা এখন আর কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। ফ্যানি হিল যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় আজকাল। মনে আছে আমাদের সেই সাইক্লোস্টাইলড কপি পড়তে হোতো লুকিয়ে চুরিয়ে ? সেই লাইনগুলো "সুস্বাদু মাংসের ফাঁকের ওপর সামান্য উঁচু জায়গায় চমৎকার হেয়ার-এর ঘেরাটোপ, ঈষৎ উন্মুক্ত হলে লোভনীয় এক প্রবেশ পথের আমন্ত্রণ" ? অথবা লেডি চ্যাটারলিজ-এর কনি "হাত দুটো শার্দা তলপেটের ওপর রেখে তাকে আরো কাছে টেনে আনলো যাতে ওর ঝুলন্ত-দুলে-ওঠা-বুক তার উত্তেজিত পৌরষকে স্পর্শ করতে পারে"।...এখন লোকেরা আগের মতো সেকসকে ভয় পায় না, তারপর একটু যদি শিল্পসম্মত হয়—

জাডওয়ের বই শুধু সেকসের ব্যাপারে নিষিদ্ধ হয় নি, ফিল বললো, ওর মধ্যে এমন কিছু সেকস আছে যাতে ধর্মীয় পবিত্রতা নাকি নষ্ট হয়।

ওতে ভাববার কিছু নেই, ব্যারেট জবাব দিলো, অনেক বিশেষজ্ঞ যারা ইতিমধ্যেই বইটা লুকিয়ে পড়েছে, তাদের মতে 'সাত মিনিট' শিল্পসম্মত লেখা। তোর এতো চিন্তা করার কিছু নেই— এতোক্ষণ ধরে তোকে যা বলার চেষ্টা করছি।...

ব্যারেটের ধারনা ফিল সব সময়েই ভবিষ্যতের ছবির মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, কেউ কেউ যেন অতীতের মধ্যে বাঁচে। তবুও, ব্যারেট বন্ধুর এই দোষটা উল্লেখ না করে প্রশ্ন করলো :

কোনো গোলমাল হয়েছে না কী ?

হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক আগে, তোদের ওখানকার এক বইয়ের দোকানের মালিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে আমার বই বিক্রি করার অপরাধে। আমি একটু আগে খবর পেয়েছি—

ফিল ফ্রিমস্টের গ্রেপ্তার কাহিনী সবিস্তারে ব্যারেটকে জানালো। আরও বললো :

শ্লীল সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ ইত্যাদি কারবারে জড়িত, অর্থাৎ অশ্লীলতা বিরোধী একটা গোষ্ঠি ওখানে আছে সব নীতিবাগীশ রুচিবান লোকজন নিয়ে। মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার নামে ওদেরই একজন 'সাত মিনিট' পড়ে ডিসট্রিকট এ্যাটর্নির কাছে লম্বা আবেদন পেশ করেছে, তারই ফলে ফ্রিমস্টকে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে আশিটা সাত মিনিট বাজেয়াপ্ত করেছে। ফ্রিমস্টকে এখুনি ছাড়িয়ে আনা দরকার জামিনে। না হলে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ ডুবে যাবে। বইঅলারা যদি জানতে পারে আমরা তাদের পেছন আছি, তাহলেই বইটা বেচতে সাহস পাবে। মামলা মোকদ্দমা চলুক। মাইক—এসব ব্যাপারে তুই ছাড়া আমাকে সাহায্য করার আর কেউ নেই।

ফ্রিমস্ট কোন জেলে আছে ? সেনট্রাল ? ঠিক আছে। জামিনের ব্যবস্থা করছি। মামলা কী ধরনের হবে ?

মানে, দোষী না নির্দোষ ?

হ্যাঁ। নির্দোষ বললে মামলাটা চলবে। মানে ফ্রিমস্ট যদি নিজেকে নির্দোষ বলে। ফ্রিমস্টকে আগে বের কর। দোষী বললে—

দোষী বললে, ঝামেলা থাকবে না। হাজার ডলার জরিমানা এবং বাজেয়াপ্ত প্রত্যেকটি বই পিছু পাঁচ ডলার জরিমানা, অর্থাৎ চৌদ্দ শ' ডলার, অথবা ছ'মাসের জেল। আবার ধরা পড়লে

দু হাজার ডলার জরিমানা, আর বই পিছু পাঁচ—এক বছরের জেল। ফ্রিমস্ট আগে কখনও ধরা পড়েছে পোর্ণো বিক্রির অভিযোগে?

হ্যাঁ। অনেক বছর আগে। পোর্ণো পত্রিকা বিক্রি করার অভিযোগে। না, না—ফ্রিমস্টের মতো দোকানদারকে এক বছর জেলে রাখলে আমার দারুণ ক্ষতি হবে।

তাহলে, ব্যারেট ভেবে-ভেবে বললো, দেখি কি করা যায়। এলমো ডানকান, ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নি, এমনি লোক ভালো। কথা বলা যায়। উইলার্ড ওসবোর্ণের পার্টিতে আমার সঙ্গে দু একবার দেখা হয়েছে, ওসবোর্ণের মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব-খাতির তাও লোকটার জানা। একটু চেষ্টা করলে একটা লাইন করতে পারবো বলে মনে হয়।

মাইক—তুই আমার কতো উপকার করবি জানিস না—

ব্যারেট মনে মনে ভাবছিলো, উপকার আর কোথায়, ফিলই একবার ওর উপকার করেছিলো ছোট্টো একটা দেনা শোধ করে। ব্যারেট ভোলেনি অযাচিত সেই উপকারের কথা। সে ফিলকে আশ্বস্ত করলো। যথাসাধ্য চেষ্টা করে ফ্রিমস্টকে ছাড়িয়ে আনবে।

জামিনের তোড়জোড় করার আগে ব্যারেট জেলকিনের সেক্রেটারিকে ফোন করলো। জেলকিন যেন আসার সময় ক্যালিফোরনিয়া আইনের অশ্লীলতা বিষয়ক আইনের ফোটো কপি নিয়ে আসে। গরিব এবং সৎ হওয়া নিশ্চয়ই ভালো, ব্যারেট মনে মনে জেলকিনের উদ্দেশ্যে জানালো, কিন্তু সৎ এবং বিত্তবান হওয়া আরও বেশি ভালো। জেলকিন নিশ্চয়ই বুঝবে।

মাইক ব্যারেটের হাতে অশ্লীলতা বিষয়ক আইনের ফোটো কপি। জেলকিন মার্টিনিতে চুমুক দিতে দিতে মেনুর ওপর চোখ ডুবিয়ে। জেলকিনের মুখ চোখ বেশ খুশি খুশি দেখে ব্যারেটের অপরাধবোধ আর একটু তীব্র হোলো। অবিশ্যি জেলকিন এমনিতে সব সময়েই বেশ হাসি খুশি।

মুখটা নির্দোষ। সরস। কিন্তু ওর নির্দোষ মুখের আড়ালে লুকিয়ে থাকে ব্যাঘ্রের ক্রোধ যখন কোনো মামলা প্রমাণ করার ঘটনা ঘটে।

ছোট্টো মাথা। একরাশ কালো চুল। চোখে কালো ফ্রেমের বিরাটাকার চশমা।

বেঁটে। সামান্য ভুঁড়ি। কোটের উপর সিগারেটের ছাই। বিরাট লোকেরা জেলকিনকে সব সময়ে চোখে-চোখে রাখতে চায়। বয়স্ক মহিলারা সব সাজতে চান। ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, খেলনা মাপের এই লোকটির মাথার মধ্যে কী প্রচণ্ড নিক্ষেপন শক্তি লুকিয়ে আছে।

জেলকিনের জীবনে বাতিক মাত্র দুটি।

একটি নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি একান্ত সততা। ভাবে ভাষায় কাজে। গালাগাল তার মুখ দিয়ে কোনো দিন বেরোয় না, যা বেরোয় তা হোলো সস্তা সাহিত্য-ঘেষা নিন্দা ভাষণ।

আর একটি: আমেরিকার সংবিধানের মানবিক অধিকার কীভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তা নানাভাবে প্রমাণ করা।

জেলকিন জিজ্ঞেস করলো, কী খাওয়া যায়।

মাইক তাড়াতাড়ি জবাব দিলো, যা খুশি খাও না—

আর যা খুশি! জেলকিন দুঃখ-দুঃখ গলায় জবাব দিলো, কাল রাতে আমার সবচেয়ে ছোটো মেয়েটা গুটি গুটি ক'রে পেটে খোঁচা দিয়ে বলে উঠলো, 'বাবা, তুমি কি প্রেগন্যান্ট?' নার্সারিতে মেয়েটা যে কী শিখেছে! তবুও, আমি বুঝতে পারলাম আমার শরীরটা কি রকম বেঢপ হয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে হামবার্গার স্টেক ও কালো কফির অর্ডার দিয়ে ওরা আলোচনায় বসলো।

ফিলের ব্যাপারটা আলোচনা করে ব্যারেট ফোটো কপি দেখালো:

অশ্লীলতা সম্বন্ধে আইনের সংজ্ঞা একেবারে হযবরল! কোনো পরিষ্কার নেই।

জেলকিন হাসলো:

রিচার্ড কু—ন্যুইয়র্ক ডিসট্রিকট এ্যাটর্নির সহযোগী অশ্লীলতার সংজ্ঞা বের করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে মন্তব্য করেছিলো, অসম্ভব—গাছ থেকে ফল কেটে আবার গাছে জুড়ে দেওয়ার মতো শক্ত! জাজ কার্টিস বোক বলেছিলো চর্বি লাগানো শুয়োরের বাচ্চা ধরার মতো—খালি পিছলে যায়। জাসটিস ষ্টুয়ার্ট ই শুধু বলেছিলো, অশ্লীলতার সংজ্ঞা—সংজ্ঞা দিতে পারবো না—তবে দেখলে বুঝতে পারবো!

ব্যারেট জবাব দিলো:

আমি অবিশ্যি হ্যাভলক এলিসের কথায় যাবো। অশ্লীলতার ধারণাটা এতো অস্পষ্ট, অর্থাৎ মনের মধ্যে যে ধারণার জন্ম হতে পারে, তার কোনো সংজ্ঞাই নেওয়া যায় না। ন্যাংটো মেয়ের ছবি দেখে একদল বলবে আর্ট, আর একদল বলবে নোংরা ছবি।

মাইকেল, ন্যাংটো মেয়ের ছবি সব সময়েই আর্ট।

একটা সমস্যার সমাধান হোলো। ব্যাপারটার এতো সহজে মীমাংসা হলে কোনো গণ্ডগোলই থাকতো না। ফিল মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, ব্যবসায়ী স্বার্থ ছাড়াও জাডওয়ের বইটা আর্ট, আর এলমো ডানকান—জনসাধারণের নিরাপত্তার ভার, যার হাতে, সে বলছে বইটা নোংরা। ফিল বলছে বইটার একটা 'সামাজিক দিক' আছে, ডানকান বলছে, সেকস ও নগ্নতা সমাজের ক্ষতি করে, মনের মধ্যে লজ্জাকর ও কুৎসিত কামনার সৃষ্টি করে। আর এর মধ্যে জান যাচ্ছে ফ্রিমস্টের।

কড়া রকম একটা মামলা চালাতে পারলে…

উঁহু। ব্যারেট বললো, ফ্রিমস্টকে নিয়ে নয়।

(শেষাংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়)

জ্যোতিষীর আসর

শিবশংকর ভারতী

জ্যোতির্বিদের ডায়েরী থেকে ঃ—

চেম্বারে ঢুকে নমস্কার জানিয়ে বসলো একটি ছেলে। চোখ দুটো দেখে মনে হলো অনেক কথা বলতে চায় একবারে। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই কুষ্ঠিটা বের করে বললো,

দেখুন, আমার বয়স ২৯ বৎসর। বিয়ে করেছি। একটা মেয়ে আছে। মেদিনীপুরে আমার বাড়ী। দুটো ব্যবসা আছে। আমার সমস্যাটা হলো, স্ত্রীর সাথে একদমই মনের মিল হয় না। বিয়ের পর থেকেই অশান্তিতে ভুগছি। যাই হোক, আমি কোলকাতায় মালপত্র কেনাকাটা করতে আসি। একবার আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে যায় প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে। তারপর যখনই আমি কোলকাতায় আসতাম তখনই ওখানে যেতে থাকলাম। এইভাবে যেতে থাকায় কেমন যেন একটা টান এসে গেল। মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেললাম। এমনভাবে দেড় বছর কেটে গেল। ও আমার সমস্ত অভাব মিটিয়েছে। যা আমার স্ত্রীর কাছ থেকেও পাইনি। এখন আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনি একটু দেখুন, ওকে বিয়ে করলে সুখী হতে পারবো তো? আপনি যদি বলেন, তবেই আমি এগোবো।

কথাগুলো বলেই চুপ করে গেল। আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, দেখুন, ওনার হাত বা কুষ্ঠি না দেখলে সঠিক কোন মতামত দিতে পারবো না। আপনার যদি বিশেষ কোন অসুবিধে না থাকে ওনাকে একবার আনতে পারেন।

শিয়ালদা থেকে কয়েক মিনিটের পথ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এসে থামলো চেম্বারের সামনে।

চেম্বারে ঢুকে প্রণাম জানিয়ে বসলো মেয়েটি। শ্যামবর্ণা। বয়স ২২/২৪। টানা টানা চোখ। সারা দেহ থেকে আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে। অগুণতি পুরুষের অত্যাচারেও দেহের কোথাও এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। হাত দুটো এগিয়ে দিল। আমি মনোযোগ দিলাম। হঠাৎ মেয়েটি বললো :

দেখুন, আমাদের কাছে বাবুরা এলেই বলে, 'তোমাকে ভালোবাসি। বিয়ে করতে চাই।' নেশার ঘোরে এরকম বলাটা বাবুদের একটা বিলাসিতা। তবে 'ও' একটু অন্য ধরনের। আমি খাঁটি বেশ্যা। ওর সমাজ সংসার আত্মীয়েরা মেনে নেবে না। আপনি যদি বলেন, ওকে বিয়ে করলে পরে অশান্তিতে ভুগবে না, আমরা সুখী হবো, তবেই ওর সাথে যাবো। নইলে যা করছি তাই-ই করবো। পরে কোন অশান্তিতে ভুগতে চাই না। আর একটা কথা, এখন পেটে তিন মাসের একটা বাচ্চা আছে। এটা ওর নয়। ও বলেছে সামনের সপ্তায় নার্সিংহোমে নিয়ে যাবে। আপনি একটা দিন দেখে দেবেন, যেদিন গেলে কোন অসুবিধে বা বেশী কষ্ট হবে না।

(চলবে)

রাশিফল

মেষ রাশি

মানসিক অস্থিরতা বাড়বে অতিমাত্রায়। আয় ও কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে দুর্ভাবনা দেখা দেবে। শরীর ভালো না। কারো সহায়তা লাভ, নতুন কোন যোগাযোগ, কথার দোষে অশান্তি, সন্তানের স্বাস্থ্যহানি যোগ। প্রণয়ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেবে। মেষলগ্নের পক্ষে সময়টা মানসিক উদ্বেগের।

বৃষ রাশি

সাংসারিক ব্যাপারে মনোতৃপ্তির অভাব, কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ কোন ঝামেলা বা সমস্যা সৃষ্টি, কারো সাথে অকারণ মনোমালিন্য, কোন শুভ যোগাযোগ নষ্ট, অযথা অর্থ ব্যয়, নিকট আত্মীয়ের ব্যাপারে দুর্ভাবনা এবং শরীর অস্বস্তিকর। প্রণয়ক্ষেত্র আনন্দ দেবে না। বৃষলগ্নের স্বাস্থ্যহানি ও কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি।

মিথুন রাশি

দেহ ও মনের উপর কখনো চাপ থাকবে। সব কাজের একটা অস্বস্তিবোধ করবেন। সামান্য ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তি, উদ্বেগের মধ্যেও আয় ও যোগাযোগ বৃদ্ধি, আঘাত বা রক্তপাত, ভ্রাতৃস্থানীয়ের কারো ব্যাপারে দুর্ভাবনা দেখা দেবে। প্রণয়ক্ষেত্রে অশান্তি বর্তমান থাকবে।

মিথুনলগ্নের দৈহিক ও মানসিক উদ্বেগ।

কর্কট রাশি
কর্ম ও আর্থিক ক্ষেত্র থাকবে পূর্বের মতো। কোন লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন হবে না। ব্যয় চাপ বাড়বে অতি মাত্রায়। কোন স্বজনের জন্য মানসিক কষ্ট, টুকটাক আঘাত লাভ, পরিচিতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ ও বিলাসদ্রব্য কেনাকাটার যোগ। প্রণয়ক্ষেত্র মানসিক আনন্দ বৃদ্ধি করবে। কর্কট লগ্নের যোগাযোগ কারক সময়।

সিংহ রাশি
মানসিক উদ্বেগ ও কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও কোন নতুন আশার আলো দেখতে পাবেন। সামান্য রাগ বাড়বে। সামান্য আর্থিক টান পড়বে। কোথাও বেড়াতে যাওয়া, কারো প্রতি মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা এবং শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করবে। প্রণয়ক্ষেত্রে সাময়িক বিচ্ছেদ যোগ। সিংহলগ্নের মানসিক আঘাত যোগ।

কন্যা রাশি
ব্যয়চাপ সামান্য বাড়লেও আয় ও আর্থিক ক্ষেত্র সুপ্রসন্ন। পারিবারিক ব্যাপারে দুর্ভাবনা, পুরনো কোন ঘটনার জেরে মানসিক অশান্তি, কর্মে অনিচ্ছা, কোন ব্যাপারে উদ্বেগ বা ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি, সামান্য অর্থ কিংবা কোন দ্রব্যলাভ যোগ। প্রণয়ক্ষেত্রে মানসিক প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পাবে। কন্যা লগ্নের শারীরিক অস্বস্তি।

তুলা রাশি
অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ ও যোগাযোগকারক সময় চলছে। আয় বাড়বে নিঃসন্দেহে। কোন আশাপ্রদ সংবাদ প্রাপ্তি; পুরনো কোন বন্ধুর সাথে যোগাযোগ, সামান্য কোন কারণে মানসিক উত্তেজনা, দেবালয় ভ্রমণ এবং শরীরটা একটু অস্বস্তিকর। প্রণয়ক্ষেত্রে আনন্দ, তুলালগ্নের আর্থিক উন্নতি ও যোগাযোগ বৃদ্ধি।

বৃশ্চিক রাশি
সামান্য মানসিক অস্থিরতা থাকলেও কর্মক্ষেত্রে অভাবনীয় যোগাযোগ আসবে। আয় বাড়বে। অপ্রত্যাশিতভাবে টুকটাক অর্থ হাতে আসবে। কোন গুণের জন্য সমাদৃত, কারো সহায়তা লাভ, ও পারিবারিক অস্বস্তিযোগ। প্রণয়ক্ষেত্রে মানসিক আনন্দ থাকবে। বৃশ্চিক লগ্নের স্বাস্থ্য অসুবিধায় ফেলবে।

ধনু রাশি
টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে সপ্তাহের অধিকাংশ সময়টা কাটবে। ভালো কোন পরিবর্তন হবে না। কোন দ্রব্য ক্ষতি বা হারাতে পারে। শরীরটা ভালো যাবে না। মানসিক অস্থিরতা বাড়বে। প্রয়োজনীয় অর্থলাভে বাধা নেই। দেবালয় ভ্রমণ যোগ। প্রণয়ক্ষেত্রে মানসিক চাপ বৃদ্ধি করবে। ধনু লগ্নের স্বাস্থ্যহানি ও মানসিক চাপ।

মকর রাশি
কারো সমালোচনায় মন আহত, কর্মক্ষেত্রে কোন নতুন যোগাযোগ, কারো মৃত্যু সংবাদ লাভ, কোন ক্ষতি, অর্থ অযথা ব্যয়, পারিবারিক দুর্ভাবনা, পরিচিতের বাড়ী বেড়ানো, কোন ব্যক্তির সহায়তা লাভ যোগ। প্রণয়ক্ষেত্র হৃদ্যতা বৃদ্ধি করবে। মকর লগ্নের কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ বাড়বে।

কুম্ভরাশি
মানসিক অশান্তি বাড়বে প্রচণ্ডভাবে। পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি, শারীরিক আমেজ নষ্ট, কোন কাজে স্ফূর্তি না পাওয়া, হওয়া কাজ নষ্ট হওয়া, আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে অশান্তি ও দুর্ভাবনাও কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। প্রণয়ক্ষেত্রে সাময়িক বিচ্ছেদপালা। কুম্ভলগ্নের সর্বাঙ্গীন অস্বস্তিসূচক সময়।

মীন রাশি
কেউ শত্রুতা করলেও যে কোন কাজ নির্ভয়ে করতে পারেন। যোগাযোগ ও আর্থিক উন্নতির পক্ষে অনুকূল। কোন নতুন দ্রব্য কেনাকাটা, কোন কাজে ভুল হওয়া, কোন দ্রব্য হারানো কিংবা ক্ষতি ও শুভ সংবাদ পাবেন। নতুন প্রেমের যোগাযোগের পক্ষে অত্যন্ত শুভ সপ্তাহ। মীন লগ্নের সাফল্যকারক সময়।

প্রশ্নোত্তর

সুশান্ত গাঙ্গুলী, শেঠ বাগান রোড, কলি-৩০

আমার জীবনে প্রেম এসেছে। মানসিক দিক থেকে দুটো মেয়ের সঙ্গেই আমি জড়িয়ে পড়েছি। প্রথমটি আমাদের পাড়াতেই থাকে। তার সঙ্গে আমার আলাপ চার বছর হবে। পড়াশুনায় সে আমার থেকে অনেক বেশী। আমার শিক্ষা নবম শ্রেণী। এই জন্যই হয়তো মেয়ের মা আমার সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে কিছুতেই সমর্থন করেন না।

সেই জন্যই হয়তো প্রায়ই খিটিমিটি লেগে থাকে। তবে এখন কিন্তু বেশ ভালো বাসে। ছাড়তে নাছোড়বান্দা। এক পাড়াতেই থাকি। রোজ দেখা হয়।
দ্বিতীয় জন গ্রাম্য মেয়ে। নদীয়ার কোন এক গ্রামে থাকে। বয়স সতেরো আঠারো হবে। এখানে বেড়াতে এসেছিল ওর দিদির বাসায়। গ্রামের মেয়ে একটু শান্তশিষ্ট নিরীহ। তাকে দেখে কেন জানি না, আমার মনের অজান্তেই ভালোবেসে ফেলেছি। ওর দিদির সাথে আলাপ জমিয়ে দুবার ওদের গ্রামের বাড়ীতে গেলাম। একটা গ্রাম্য মেয়ের জীবনে কোন ছেলের ভালোবাসার সান্নিধ্য এই প্রথম। আমি ওকে বিয়ে করবো কথা দিয়েছি। এখন কি আমি বিমুখ করবো ?
—হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের একটা বর্ণও মিথ্যা নয়। তোমার প্রশ্নের উত্তর ভাই জ্যোতিষ বিচারে না দিয়ে ভারতীয় তন্ত্র শাস্ত্রের সাহায্য নিচ্ছি 'ভারতের তন্ত্রের ঋষিরা সকলের আগে আবিষ্কার করেছিলেন যে, যখন যৌবনের প্রভাত আসে তখন খোলা চোখে অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিতে যা দেখা যায় তাতে মনে হয় সকলের সঙ্গে সকলের একটা যেন মিল আছে। যেমন দু'টি অবিবাহিত কুমার কুমারী কোন ক্ষেত্রে এক জায়গায় দেখা হলে সেই দেখাতেই তাদের মধ্যে যদি রূপের বিশেষ তারতম্য না থাকে তবে তাদের দুজনের মধ্যে প্রথমেই এমন একটা ভাবের উদয় হয় যেন উভয়ের মিলন সম্ভব, যদিও স্পষ্টভাবে তখন দু'জনার সঙ্গে দু'জনার কোন পরিচয় নেই। কিন্তু তা ঘটে না। "কেউ মানুক বা না মানুক" প্রকৃতির হাতটি পূর্ণভাবেই নর-নারীদের মিলনের মধ্যে থাকে বলে। জন্ম-মৃত্যু বিয়ে—এ'তিন বিধাতা নিয়ে অর্থাৎ এমন কোন মিলন তিনি ঘটাতে দেবেন না যাতে তাঁর অভিপ্রায় পূর্ণ হবে না অর্থাৎ এমনই মিলনের যোগাযোগ তিনি ঘটাবেন যাতে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আবার স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যদি সত্যকার ভালোবাসা হয়, প্রকৃতি সেখানে জাতধর্ম দেখবেন না।'

মোঃ ইমাদ উদ্দীন রাহিন, শরৎগুপ্ত রোড, ঢাকা-১
আমার জীবনের তিনটে ইচ্ছা আছে। বড় নামকরা বিজ্ঞানী হওয়া, বড় সাহিত্যিক কিংবা সামরিক বাহিনীতে অফিসার হওয়া। এর মধ্যে কোনটা হবো ?
—কোনটাই না। যেমন, বিজ্ঞানী তুমি হতে পারবে না কারণ সাধারণ জ্ঞান তো নেই-ই, বিশেষ জ্ঞান তো দূরের কথা। সাহিত্যিক তো এ'জন্মে নয়ই, কারণ এত বড় একটা চিঠিতে তোমার সাহিত্য রসবোধের কোন চিহ্নই নেই। আর সামরিক বাহিনীর অফিসার হবে কেমন করে ? তুমি তো ভাই হার্টের রুগী। ইনজেকশান নিচ্ছো বিগত পাঁচ বছর ধরে।
(ডাকেও তোমার উত্তর পাঠানো হয়েছে।)

পংকজ রায়চৌধুরী, হসপিটাল রোড, শিলচর।
সত্যি কথা বলতে কি, জীবন সম্পর্কে একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছি। সিটি বাসের যাত্রীর মতো কোন রকমে পদানীতে পা রেখে ম্যাট্রিকের স্টপেজটা পেরিয়ে গেছি। তারপর কলেজের দরজায় একটা উঁকি মেরেই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। পিছনে অভাবের তাড়া, সঙ্গে অযোগ্যতা, সম্মুখে নো ভ্যাকান্সি। বেশী দিন এভাবে চলতে পারে না। এবার আপনিই বলুন, কি হবে ? কতটুকু হবে, আর কি হবে না ?
—মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুর মতো জীবন তোমার নয়। অত হতাশ হওয়ার কি আছে ? জীবনে তোমার সবকিছুই হবে। সমাজ জীবনে সর্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠা পাবে। পার্থিব সুখ ভোগের সমস্ত উপকরণই তোমার কপালে আছে। তবে একটু ধৈর্য ধরতে হবে, ৩৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত। তবে এর মধ্যে যে পরিবর্তন হবে তা ঠিক চোখলাগা নয়।

যামিনীকান্ত সাহানা, গোয়ালপাড়া, আসাম।
বর্তমানের চাকরী আপনার যাবে না, যেতে পারে না—অসম্ভব। অন্য চাকরীটা নেয়া বা না নেয়া সেটা সম্পূর্ণই আপনার উপর নির্ভর করছে। যেটা ভালো মনে করবেন, সেটাই করবেন। তবে মনে রাখবেন, অভিশপ্ত জীবন আপনার। যা কিছু করুন না কেন, ভেবে চিন্তে করবেন।

কুমকুম বেরা, গঙ্গানগর, ২৪ পরগণা।
আমার মানসিকতা এবং চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন তো দেখি ?
—চরিত্র নিয়ে এই বিভাগে কোন কথা আমি প্রধানতঃ বলি না। তবে তুমি পরীক্ষামূলক ভাবেই আমাকে প্রশ্নটা করেছো বলে উত্তর দিচ্ছি। তোমার বর্তমান বয়স ২২ বৎসর। ১৮ থেকে এই ২২ এর মধ্যে বিয়ে না করে কতবার নার্সিং হোমের শরণাপন্ন হয়েছো ? কাঁচা কথায় কতবার কাঁচা নষ্ট করেছো—তার একটা লিষ্টি দাও তারপর বলবো তোমার চরিত্র কেমন ?

জয়দেব জানা, ফুলগেড়িয়া, মেদিনীপুর।
মাষ্টার ডিগ্রী পাবো কি না ?
—পদ্মাবতী জানে।
আর্থিক দিক থেকে জীবনে উন্নতি হবে কি না ? হলে কবে থেকে ?
—আর্থিক দিক থেকে বিশেষ উন্নতি হবে ৩৬ বৎসর বয়স থেকে। তবে ১৯৮১ সন থেকে ধীরে ধীরে অর্থভাগ্য উন্নত হবে।

স্বদেশ রঞ্জন মাইতি, জগাছা, হাওড়া।
আমার প্রশ্নের উত্তর ঘরোয়াতে ছাপবেন না।
—যো হুকুম জনাব।

প্রাপ্তবয়স্ক চিহ্নিত বাংলা নাটক কী সত্যিই অশ্লীল ?

বেশ কিছুদিন ধরে, যতদূর মনে হয় 'বারবধূ' সাফল্যের পর, বেশ কিছু (A) প্রাপ্তবয়স্ক চিহ্নিত বাংলা নাটক নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি, এমন কি, কোনো কোনো প্রেক্ষাগৃহে হামলা অবধি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কিছু প্রগতিশীল নাট্যকর্মী শ্রীমন্মথ রায়ের নেতৃত্বে একটি কনভেনসনও ডেকেছিলেন এবং বলেছিলেন :

তিন মাসের মধ্যে ওই সব নাটককে মঞ্চ থেকে তুলে নিতে হবে। অন্যদিকে : যাঁরা A চিহ্নিত নাটক করছেন, তাঁদের বক্তব্য, অভিযোগ ভিত্তিহীন / তাঁদের মঞ্চস্থ নাটক মোটেই অশ্লীল নয় / আন্দোলনের পেছনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ঈর্ষা উষ্মা ইত্যাদি কাজ করছে।

কাজেই আমরা

ঘরোয়া'র পক্ষ থেকে একটি সার্ভে বা নিরীক্ষা করছি কোনো রকম ব্যক্তিগত স্বার্থ না রেখে। প্রত্যেকটি নাটকর্মী অভিনেতা অথবা নাট্য ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিদের জন্যে আমরা যে প্রশ্নমালা তৈরী করেছি, তার নকল পাশে দিলাম "ক" অংশে। ইতিমধ্যেই আমরা সংশ্লিষ্ট সবার কাছে প্রশ্নগুলি পাঠিয়েছি উত্তরের জন্যে—তাঁদের জবাব আমরা প্রকাশ করতে আগ্রহী। এবং দর্শক-দের জন্যে "খ" অংশের প্রশ্ন আমরা করেছি—"খ" অংশের প্রশ্নের উত্তর দিতে যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা অবিলম্বে প্রশ্নের উত্তরগুলি লিখে আমাদের জানান। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর / কাগজ পত্র / ছবি ইত্যাদি নিচের ঠিকানায় পাঠাবেন :

নিরীক্ষা সম্পাদক / ঘরোয়া / ৭৭-বি আচার্য জগদীশ বসু রোড / কলি-১৪

(ক) নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ/অপ্রত্যক্ষভাবে যাঁরা জড়িত তাঁরা নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন, এবং ইচ্ছে করলে কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর তাঁরা না-ও দিতে পারেন।

নাম : বয়েস :

শিক্ষা : স্কুল/কলেজ/ইউনিভার্সিটি :

কতো দিন নাট্য ক্ষেত্রে আছেন ? কী কী নাটক করেছেন ?

....বর্তমান কোন গোষ্ঠি বা নাটকের সঙ্গে জড়িত ? এবং কী হিসেবে ? পরিচালক অভিনেতা নাট্যকার কুশলী ইত্যাদি............

আপনার প্রিয় দেশী নাট্যকার/গোষ্ঠি :

আপনার প্রিয় বিদেশী নাট্যকার/গোষ্ঠি :

বর্তমানে যে নাটকটিতে আপনি জড়িত, তার শ্লীলতা/অশ্লীলতা সম্বন্ধে আপনার মতামত কী ?

নাটকটিতে কী সেকস/ইরোটিকা আছে ? থাকলে কত অংশ ?

সেকস একজিবিসিনিজম, হোমোসেকসুয়ালিটি, লিসবিয়ানিজম, মাস্টারবেসন সম্বন্ধে আপনার মতামত কী ? আপনার নাটকে, অথবা আপনার দেখা অন্য কোনো বাংলা নাটকে কী এইসব প্রবণতা আছে ?

আপনার নাটকে A চিহ্ন কোন বিচারে দেওয়া হয় ?

আপনার ছবি/নাটকের কোনো দৃশ্যের ছবি দেবেন ?

ঠিকানা : স্বাক্ষর.....................

(খ) এই অংশের উত্তর দর্শকদের জন্যে। ইচ্ছে করলে কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর তাঁরা না-ও দিতে পারেন।

নাম : বয়েস :

পেশা : শিক্ষা :

আপনি কী A চিহ্নিত নাটক নিয়মিত দেখেন ?

কোন কোন নাটক দেখেছেন ?

কোন দৃশ্য ভালো লেগেছে ?

কোন অভিনেতা/অভিনেত্রী/গোষ্ঠি আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ?

আপনি কী মনে করেন A চিহ্ন (ক) শুধুই ব্যবসা জমাবার ফন্দি এবং প্রাপ্তবয়স্কসুলভ কিছু থাকে না ; (খ) সত্যিই প্রাপ্তবয়স্ক ; (গ) ইন্দ্রিয় সচেতন করে তোলে ; (ঘ) বিরক্ত করে অথবা (ঙ) উত্তেজক মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ? (উত্তরে দাগ দিন)

এই জাতীয় নাটক চলা উচিত/উচিত নয় ?

বিশেষ কোনো বক্তব্য ?

ঠিকানা : স্বাক্ষর..................

(সঙ্গে আপনার ছবি পাঠাতে পারেন)

ছবির মানুষ

সুবোধ ভট্টাচার্য



প্রিয়তোষ বাবার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে। খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়িতে মুখের আদল কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। নিয়মের বাইরে গেলে মানুষ বুঝি এমনি করেই হারিয়ে যেতে থাকে। অথচ নিয়মের ভেতরে থাকলে সবকিছু তছনছ করার মধ্যে অন্যরকম একটা খুশি থাকে হাল্কা মেয়ের মত

বাবার মাথার কাছে টাঙানো বাবারই গণগণে যৌবনের ছবি। ভরাট চেহারার স্বাস্থ্য ও গাম্ভীর্যের আস্ফালন। ঐ বাবার সাথে খাটের ওপর দীর্ঘ অসুখে কাহিল এলিয়ে যাওয়া শীর্ণ শরীরটাকে হঠাৎ নেগেটিভ ফিল্মের মত মনে হয়। রয়ে সয়ে প্রিয়তোষ বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। এবং ক্রমশঃ তাপহীন নিস্প্রাণ জড় হয়ে যায়।

দামিনীর কাছে পিঠ ঘষটে সরে আসে অঘোর। টানা টানা নিঃশ্বাসে বুকের খাঁচা হাঁপায়। প্রিয়তোষ হাতে ধরা ওষুধের গেলাস বাবার মুখের কাছে তুলে বলে—একটু হাঁ কর তো। দামিনী অঘোরের পিঠের তলায় বাঁ হাত ঢুকিয়ে শরীরটাকে উঁচু করে ধরে। তারপর সটান নিজের বুকের গভীরে নিয়ে আসে। ডান হাত দিয়ে দামিনী আলতোভাবে বুক মালিশ করতে থাকে। ওষুধ গিলবার সময় যাতে বুকে আটকে না যায়। প্রিয়তোয় টেবিলে খালি গেলাস রেখে বাবাকে শুইয়ে দিতে সাহায্য করে। তারপর পর্দা টেনে নিজের ঘরে চলে আসে।

হৈমন্তী তাঁর লম্বা চুলের গোছায় চিরুনী ডুবিয়ে মাথা আঁচড়াতে থাকে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় বিমর্ষ প্রিয়তোষের ছবি ফুটে উঠতে হৈমন্তী বলে—কিগো, অফিস-টফিস তুলে দিলে না কি? প্রিয়তোষ চুপ করে থাকে। ওর বুকের ভেতর নেগেটিভ পজিটিভের খেলা চলতে থাকে। কিন্তু হৈমন্তীর লাজুক মুখের পাশে ড্যাব ড্যাবে চোখে তাকিয়ে থাক ওর নিজের ছবি নজরে পড়ে যায়

গায়ে বৌয়ের গন্ধ লাগবার সময় না দিয়ে দামিনী একরকম জোর করে নাবিয়ে দিয়েছিলো দুজনকে। প্রিয়তোষ নিরুৎসাহের ভাব দেখাতে দামিনী বলেছিল—যা না খোকা। বৌমাকে নিয়ে একটা ছবি তুলে আয়।

ছবি? কিসের ছবি? প্রিয়তোষ অবাক হবার চেষ্টা করে।

এই তো কদিন আগে বিয়ের সময় এক গাদা ছবি তোলা হল। আবার কেন? কিন্তু লাল শাড়ী-ব্লাউজে আগুনে হৈমন্তীকে দেখে ওর প্রতিবাদের ভিত আলগা হয়ে যায়।

সারা দেয়ালে শুধু একটাই ছবি। ঘরে বেশী ছবি টাঙানো হৈমন্তী পছন্দ করে না। এমন কি ক্যালেণ্ডার একটার থেকে দুটো হলে ক্ষেপে যায়—এটা কি পান বিড়ির দোকান?

চুলের আগার জট ছাড়াতে ছাড়াতে হৈমন্তী আবার বলে—আজও তাহলে তুমি যাচ্ছ না? বাবা তো এখন একটু ভালো। অত ভাববার কি আছে?

এই ভাববার কি আছে উত্তরটা হৈমন্তীর সাথে যেন মিলিয়ে নিতে পারে না প্রিয়তোষ। ওর মনে হয় হৈমন্তী বাবার অসুখটাকে কেমন করে যেন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ওর দিকে

তাকিয়ে প্রিয়তোষ অবাক হয়। কাঁচা রোদ্দুরের মত হৈমন্তী ঝলমল করছে। অফিসে যাবার আন্তরিক তাগিদ ছাড়া সেখানে অন্য কোন ছায়া নেই। সাথে সাথে গ্রীবাকে বুকে আগলিয়ে রাখা মায়ের জমাট কালো মুখের কথা মনে হতে থাকে প্রিয়তোষের।

হৈমন্তীর কথার কোন জবাব দিতে ইচ্ছে করে না। পর্দা সরিয়ে বাবার শরীরের উপর ঝুঁকে পড়ে। অসহায়ভাবে হাত দুটো বুকের ওপর ভাঙ্গা। সারা মুখে বেড়ে ওঠা পাকা দাড়িতে বাবাকে যেন অনেক দূরের মনে হয়। নিস্তেজ মানুষটার রুগ্ন চেহারা প্রিয়তোষকে নেগেটিভের ভাবনার ভেতর বন্দী করে ফেলতে থাকে। ওর মনে হয় বাবার আসল চেহারা মাথার ওপর ঝোলান ওই ছবিতেই রয়েছে। এটা বাবার বয়েসের সাথে অযত্ন অবহেলার নেগেটিভ ছবি। কিন্তু এই ভাবনার কথা হৈমন্তীকে বলতে সাহস হয় না। মায়ের কাছে কথাটা বলতে চেয়েও পারে না। ভাবে, এতে হয়তো হৈমন্তীর দোষ বেরিয়ে পড়বে।

দামিনী ছোট বাটিতে গরম দুধ নিয়ে আসে। প্রিয়তোষকে কিছু করবার সুযোগ না দিয়ে দামিনী অঘোরের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—শুনছো, একটু উঠে বসো। দুধ এনেছি। অঘোর ঘোলা দৃষ্টিতে যেন অতীত দেখতে থাকে। চোয়াল নড়ে। কিন্তু কথা সরে না। ক্ষীণ কণ্ঠের অস্পষ্ট আওয়াজে সব শেষ হয়ে যায়। প্রিয়তোষ বাবাকে ধরে বসায়। দামিনী দুধের বাটি সন্তর্পণে মুখে তুলে ধরে। প্রায় বন্ধ চোখে ঘুমের রেশ লাগা শিশুর মত অঘোর অনেক সময় নিয়ে দুধ খেতে থাকে। প্রিয়তোষ লক্ষ্য করে মায়ের মুখের ভাঁজে কঠিন কর্তব্য ভালোবাসাকে আড়াল করতে পারে নি।

খাওয়ার পর শেষ প্রসাধনটুকু সেরে হৈমন্তী শ্বশুরের ঘরে ঢোকে। মুখে আলগা চিন্তার ভার। একটুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, মা আমি তা হলে চলি। আপনার ছেলে তো রইল। হাত পা আবার ফুলছে কেন একটু যেন ডাক্তারের সাথে কথা বলে ওষুধ নিয়ে আসে।

হৈমন্তীর গলার দুঃখ কাউকে তেমন স্পর্শ করে না। দামিনী নির্বিকারভাবে শিশি থেকে একটা ক্যাপসুল আর দুটো ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্স বার করতে থাকে একমনে।

হৈমন্তী চলে গেল। ইনটিমেটের সুগন্ধ হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। প্রিয়তোষ বাবার পাশে বসে টেবিল ফ্যানটা চালিয়ে দেয়। প্রায় চিৎকার করে বাবাকে জিজ্ঞেস করে—তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে নাকি? অঘোর কোন্ সুদূর অতীত থেকে যেন নিজেকে টেনে তুললো। ভাসা দৃষ্টি নিয়ে একবার দামিনী আর প্রিয়তোষকে দেখে আবার ডুব দিতে যাবে এমন সময় দামিনী বলে ওঠে—তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে? খোকা জিজ্ঞেস করছে? অঘোর সোজা দৃষ্টি ফেলে এবার আস্তে করে বলে—না। মাথা নাড়িয়ে সেই কথার পুনরুক্তিও করে যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয়।

হঠাৎ প্রিয়তোষ মাকে জিজ্ঞেস করে, বাবার বয়স কত হল, পয়ষট্টি নয়? দামিনী বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। নিস্পৃহ গলায় বলে, আটষট্টি চলছে। মুহূর্তে আলো চলকে ওঠে প্রিয়তোষের চোখে। এত অল্পেই সে বাবাকে ছেড়ে দেবে না। বাবা আবার ফটোর আদল পাবে চোখে মুখে। স্বয়ংসম্পূর্ণ বাবা হয়ে উঠবে প্রিয়তোষের। বিকেলের পড়ন্ত রোদে দুর্বো ঘাসে পা ফেলে বাবা আবার পায়চারি করবে। ঝাঝরি দিয়ে নিজের হাতে গড়া সৌখিন ফুল বাগানে জল ঝড়াবে। মুঠোয় ধরা সুখের দিনের উত্তেজনায়, সাতের কোঠায় পা না দিইয়ে বাবাকে আমি ছাড়ছি না মা, কথাগুলো চিৎকারের মত চারিধারে ছড়িয়ে ফেলে।

অঘোর প্রিয়তোষের শরীরে নিজের হাত তুলে দেয়। কি যেন খুঁজছে এমনভাবে হাতখানা শরীরময় নড়াচড়া করতে থাকে। দামিনীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, খোকা তোর বাবা তোকে আশীর্বাদ করছেন আবার আলো ঝলকায় প্রিয়তোষের চোখে। বাবার জোয়ান ছবির দিকে ওর দুচোখ নিবিষ্ট হয়ে পড়ে।

অঘোর এবার ফুলে যাওয়া বা-হাতখানা অতি কষ্টে দামিনীর কোলে এনে ফেলে। হাতড়ে হাতড়ে হাত খুঁজে দামিনীর হাত ধরে। তারপর বুক ভর্তি জমা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুটস্বরে বলে—সব ভুল। ও যা ভাবছে সব ভুল।

মুহূর্তে প্রিয়তোষের বিশ্বাসের আলোটা এক ফুৎকারে নিভে যায়। তাল তাল অন্ধকারে তবু প্রিয়তোষ সবাইকে যেন ঠিক ঠিক চিনতে পারে। শুধু বাবার সেই ছবিটাই যেন কোথায় হারিয়ে যায়। কিছুতেই প্রিয়তোষ খুঁজে পায় না।



একটা শক্ত দেখে চশমার বাক্স আলাদা ভাবে কিনেছিল অমিয়। দোকান থেকে চামড়ার যে খাপটা দিয়েছিল সেটা ভীড়ের চাপ সহ্য করতে পারত না। বাক্সর মধ্যে থাকলেও কাঁচে স্ক্র্যাচ পড়ে যেতে পারে, অমিয় কাঁচ মোছার কাপড়টা দিয়ে চশমাটা মুড়ে তারপর বাক্সর মধ্যে রাখত। পাওয়ার বেড়ে যাবার জন্য ডাক্তারবাবু অবশ্য সব সময় পরে থাকতে বলেছিলেন। অমিয় কিন্তু চশমাটা সব সময় পরতে চায় না। সত্যি চশমাটা পরলে ওর চেহারাটা বেমালুম পাল্টে যায়। ভীষণ পার্সোনালীটি বেড়ে যায়। চশমাটা পরে দু-তিনটে অফিসে অর্ডার পাওয়ার জন্যে গেছিল, তখন ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারছিল। উদ্দেশ্য বুঝতে না পারা অব্দি অফিসের লোকজন ওকে বেশ পাত্তা দিচ্ছিল।

চশমাটা পছন্দ করার সময় অমিয়র খুব রীতার কথা মনে পড়ছিল। কলেজে পড়ার সময় রীতা খুব ঠাট্টা ইয়াকি করত ওর আদ্যিকালের চশমা নিয়ে।

এমন হাঁদারামের মত চশমা পর কেন তুমি? সেই জন্য তো কোন মেয়ে তোমার দিকে তাকায় না।

সবাই না তাকালে আমার বয়েই গেল, শুধু একজন তাকালেই হোল।

এরকম বুড়োটে মার্কা লোকের দিকে তাকাতে আমার ভারী দরকার পড়েছে।

অমিয় হাসতে হাসতে বলত—জিনিষটা প্রয়োজনের অসুবিধা না হলেই হোল, ফ্রেম ট্রেম নিয়ে কি হবে। এই মুহূর্তে অমিয়র চশমা দেখলে রীতা নিশ্চয়ই বলত—তাহলে প্রয়োজনটাই সব নয় কি বল? প্রয়োজন ছাড়াও আরও কিছু একটা আছে যেটা বাদ দিয়ে জীবন নয় তাই না? রীতা খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলত। সেই লোভেই অমিয় রীতার সংগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারত গল্প করত।

নতুন চশমা করাটা একরকম হঠাৎই হয়ে গেল বলতে গেলে। পি, ডব্লু, ডি-এর কতকগুলো কাঠেই মই সাপ্লাই দিয়ে শ-দেড়েক টাকা হঠাৎ লাভ করে ফেলল অমিয়। বিল পেয়ে অতবড় অফিসে চা-মিষ্টি খাওয়াতেই পঞ্চাশটা টাকা হাওয়ার মতো উড়ে গেল। বাকি টাকাটা বাড়ীতে নিয়ে গেলে ভালই হয় —এর তো আর শেষ নেই। একেবারে রাবনের চিতা, যা নেবে নিমেষেই শেষ। চশমার ভাবনাটা মাঝে মধ্যেই মাথায় আসা যাওয়া করত অমিয়র। ঠিক সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। চশমাটার একটা ডাঁটি নড়বড় করছে, ওটা আর স্ক্রু-ট্রু পাল্টেও ঠিক হচ্ছে না। ফ্রেমের ভিতরও কেমন যেন সাদা কাটা কাটা দাগ হয়ে গেছে। যা হয় হবে আজ আর কিছু ভাববে না। হাতের সামনে একটা বাস পেয়ে সোজা বউ-বাজারে চলে এল অমিয়। স্বপন বউ-বাজারেই একটা বড় সড় চশমার দোকানে সেলস কাউণ্টারে কাজ করে। ওর কাছেই যাবে ঠিক করল, একটু আধটু সস্তাও হয়ে যেতে পারে ঠকবার ভয়ও কম। স্বপনই ফ্রেমটা পছন্দ করে দিল। চশমাটা পরে শো-কেসের উপর রাখা আয়নাটার দিকে তাকিয়ে অমিয়র কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। স্বপনটা কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল—এবার থেকে একটু দেখে শুনে চলো গুরু নজরে পড়ে যেতে পার। সিলভার মেটালের ফ্রেম কাঁচটা হাল্কা গোলাপী রঙের। স্বপন বেশ কম করিয়ে দিল, সব শুদ্ধু পঁয়ষট্টি টাকা। কত দিন পর একটা শখের জিনিষ করল অমিয়।

ঝোলাটা সামনে টেনে নিয়ে বসতে যাবে

তখনই নজরে পড়ল ব্যাপারটা। হাল্কা ভাবে কাঁধের পাশে ঝুলছে ঝোলাটা তাড়াতাড়ি বাঁ হাতটা ভিতরে চালিয়ে দিতেই বিনা বাধায় হাতটা নীচের কাপড়ে এসে ঠেকল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়ল অমিয়। প্রায় শূন্য ট্রাম ষ্টপেজ। একটা জুতো পালিশ করা ছেলে মাথায় বাক্সটা দিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। অন্য কোনায় সিমেন্টের বেদীর উপর বসে ট্রাম কোম্পানীর একজন লোক হাতের তালুর উপর অন্যমনস্ক ভাবে খৈনী ডলছে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল অমিয়র। এদিক ওদিক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে তাকাতে এলোমেলো ভাবে পা ফেলে ফেলে আস্তে আস্তে হাঁটছে ও। ভাবতেই পারছে না ব্যাগটা নেই। ঝোলার মধ্যে হাতটা ঘুরছে ফিরছে। আঙুল গুলো ঝোলার নীচে সুতোগুলোয় বিলি কাটছে যেন এক্ষুণি স্পর্শ পাবে ব্যাগটার।

কালো রঙের চামড়ার ব্যাগটার মধ্যে টুকিটাকি অনেক জিনিষ থাকত অমিয়র। রবার স্ট্যাম্প, লেটার প্যাড, ডট পেন, ক্লীপ ইত্যাদি আর ছিল শক্ত খাপের মধ্যে সযত্নে কাঁচ মোছা কাপড় দিয়ে মোড়া অমিয়র নতুন চশমাটা। তার সখের চশমা। যেটা নিয়ে ওর গর্বের শেষ নেই, ওর অনেকদিনের পরিকল্পনার ফসল। দৃশ্যটা চোখের উপর আস্তে আস্তে ভেসে উঠল। দুপুরবেলায় ট্রাম প্রায় ফাঁকা ফাঁকা। ট্রামটা এসে স্টপেজে দাঁড়াল। অমিয় উঠতে যাবে ঠিক তখনই কোত্থেকে তিন চারটে ছেলে এসে দরজাটা প্রায় আটকে দাঁড়াল। অমিয় ঘুনাক্ষরেও তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। ট্রামটা ছেড়ে দিতেই ও কোনরকমে লাফ দিয়ে হ্যাণ্ডেলটা ধরে ঝুলে পড়ল। কি ব্যাপার একটু সরুন না ভেতরটাতো ফাঁকাই রয়েছে! প্রায় জোর করেই ঠেলে ভেতরে ঢুকতে হয়েছিল ওকে। ইস্ ছেলেগুলোর মুখগুলোও যদি একটু মনে করতে পারত, যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যেত ওদের সংগে—

না। এভাবে আর চলতে পারে না, কতদিন হয়ে গেল ঠিক একই ভাবে চলছে তো চলছেই এর যেন কোন শেষ নেই। কবে যে শুরু করেছিল তাও যেন মনে করতে পারছে না, সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব যেন ওর একার আর কারও কিছু করার নেই। তাতেও ও মনে কিছু করত না, খাটতে তো ও ভালই বাসে। শুধু একটু উৎসাহ একটু সহানুভূতি তা সেটুকুও ওর কপালে জোটে না।

অতীনের সঙ্গে তো কথা বলতেই আজকাল কেমন ভয় ভয় করে অমিয়র। কেমন যেন কাটা কাটা কথা বলে, কথা বলার সময় চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে। সবকিছুর উপরই ওর যেন জাতক্রোধ। যখন তখন বাড়ী আসে। খেতে চায়। মা তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে আসে, দেরী হলেই পায়ে চটিটা গলিয়ে ফট ফট করে বেরিয়ে যায়। কোথায় যে যায় কে জানে।

অথচ অমিয় প্রাণপাত করে চলেছে, সংসারটাকে একটু দাঁড় করাতে, সংসারে একটু স্বচ্ছল ভাব আনতে তা কে কার কথা শোনে।

অম্বর সবার ছোট, অতীনের সম্পূর্ণ বিপরীত, তবে বড্ড বইমুখো। কলেজে যায় বাড়ী আসে আর কোণের ওই ছোট ঘরটায় রাত দিন টেবিলে মুখ গুঁজে থাকে। চেহারাটাও কি রকম ইট চাপা ঘাসের মত ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। যাক গিয়ে অমিয় ভাবে রেজাল্ট-টেজাল্ট যখন মোটামুটি ভালই করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অতীনটাকে নিয়েই যত ভাবনা ওর।

ব্যবসাটাকে যদি একটু ঠিক মতো দাঁড় করাতে পারে। কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পারলে এভাবে পরে পরে মার খেতে হোত না ওকে। বড় বড় অর্ডারগুলো চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হয়। অথচ কম দিনতো হোল না এই অর্ডার সাপ্লাই-এর ব্যবসা। ঠিক যেন জুত করে বসতেই পারছে না। তবুও হাল ছাড়তে পারে না অমিয়। দেখা যাক যদি কিছু করা যায়।

কতক্ষণ হাঁটছে খেয়ালই ছিল না অমিয়র। রাস্তা ছেড়ে কখন মাঠে নেমে পড়েছে বুঝতে পারে নি। ছায়া ছায়া সবুজ তাবু এদিক ওদিক। তাঁবুর ছায়ায় বেঞ্চি পাতা। অমিয় বসে পড়ে। এই সমস্ত ঘটনাগুলো ওকে কেমন দমিয়ে দেয়। এই সব হঠাৎ পাওয়া দুঃখগুলো যেগুলোর জন্য কোন মানসিক প্রস্তুতিই ছিল না। সেগুলো যেন বুকের উপর আস্তে আস্তে চেপে বসে।

গত বছর এইরকম সময় একটা পোর্সিলীন ইনসুলেটরের অর্ডার পেয়েছিল অমিয়। মাল সাপ্লাই দিতে হবে সাইট অফিসের ষ্টোরে। পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। অফিসের পর ষ্টোর-

(শেষাংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়)

গোলমাল ছবির গান ও স্বরলিপি

শিল্পী : রাহুলদেব বর্মণ ও স্বপন চক্রবর্তী কথা : গুলজার

সুর রাহুলদেব বর্মণ স্বরলিপি : শ্রীঅপূর্ব সাহা

গোলমাল হায় ভাই সব গোলমাল হায়
(আরে) দিনে রাখতে কি এ তেরী চাল হায়
গোলমাল হায় ভাই সব গোলমাল হায়,
গোলমাল, গোলমাল ··· ··· ॥

রূপ রোটী কি হোতো পয়সা কামাইয়ে
পয়সা কামানে কে লিয়ে তো ভি পয়সা চাহিয়ে
মাঙে সে না মিলে তো পসীনা বাহাইয়ে
পয়সা হ্যয় যব পসীনা তো রুমাল চাহিয়ে
(ও) গোলমাল হায় ভাই সব গোলমাল হায়
গোলমাল, গোলমাল হায় ··· ··· ॥

রুমাল বন্ গয়া ভীকর কামিজ ফার কর
কামিজ কে লিয়ে ভী তো ফির কাপড়া চাহিয়ে
আরে কপড়া কিসিনে দান হী মে দে দিয়া চলো
দরজী কে পাস যাকে ও পহেলে পিনাইয়ে
(ও) গোলমাল হায় ভাই সব গোলমাল হায়
গোলমাল, গোলমাল হায় ··· ··· ॥

বিন সিলি কামিজ কে তো কুছ নাহি লিয়া
সিলি হুয়ি কামিজ কে সিলাই চাহিয়ে
সিলাই সে যে কে লিয়ে ফির পয়সা চাহিয়ে
'পয়সা কামানে কে লিয়ে ফির পয়সা চাহিয়ে
ও গোলমাল হায় ভাই সব গোলমাল হায়
গোলমাল, গোলমাল হায় ··· ··· ॥

A Major Scale & Tunning

Karfa

[1st string-এর 5th fret = 'সা']

x x x x x x x x x x x x
| প ম গ রস | স স স স | | - |
গোল্ মাল্ হায় ভাই সব গোল্ মাল্ হায়

00 02 00 2 00 02 00
| প ম গ রস | স স স স | সস্ সর্ সগ্ :র্ | সস সর্ সগ্ পপ |
গোল্ মাল্ হায় ভাই সব্ গোল্ মাল্ হায় (3)———(2) (3)—————(2) আরে

Song (A)

00 02 00 2 00 02 00

| | প ম গ রস | স স স স | সস সর সগ :র | সস সর সগ সস |

গোল্ মাল্ হায় ভাই সব্ গোল্ মাল হায় (3)———(2) (3)————(2) আরে

| স র স গ | স র স | স র স গ | স র স |

পি নে রাখ্ তে কি এ তে রী চা ল হা য়্

| গ ম গ প | গ ম | গ ম গ প | গ ম |

পি নে রাখ তে কি এ তে রী • চা ল হা য়্

(1)———— ——— ——— ———

(2)———— ——— ——— ———

প ম গ রস | স স স স | প প গ | প প গ |

গোল্ মাল্ হায় ভাই সব্ গোল্ মাল্ হায় গোল্ মা ল্ গোল্ মা ল্

II

| প ম গ রস | স স স স | | | |

গোল্ মাল্ হায় ভাই সব গোল্ মাল্ হায়

Song (B)

| | প :ম ম গ | গ গ গ গম | গর :গ ম গ | গ |

রূ প রো টী কি হো তো পয় সা কা মা ই য়ে

| প পম মগ :গ | গ :গ গ গম | গর গ মগ গ | গ ম |

পয় সা কামা নে কে লি য়ে ভী পয় সা •চা হি য়ে মা

| ম ম ম ম | ম ম ম | প ধণধ প ম | প |

ঙে সে না মি লে তো • প সী না বাহা ই য়ে

| ম :ম ম ম | মম ম ম | প ধ:ণধ :প ম | প মপ |

পয় সা হায় যব পসী না তো রু মাল্ চা হি য়ে ও

| প ম গ রস | স স স স | প :ধ | প ধ প | |

গোল্ মাল্ হায় ভাই সব গোল মাল হায় • গোল্ মা ল্ গো ল্ মাল্ হায়

Back to Song (A)

Song (C)

প | | মপ :ম গ গ | গ গ গ গম | গর :গম গ গ | গ প |

রু মা ল্ বন্ গ য়া ভী কব কা মি জ্ পার্ ক র্ কা

| মপ :ম গ গ | গ গ গ গম | গর গ মগ গ | গ মম |

মি জ্ কে লি য়ে ভী তো ফির কপ্ ড়া •চা হি য়ে আরে

| ম. :ম মম :ম | ম ম ম | প :ধণধ পম ম | প ম |

কপ্ ড়া কিসি নে দা ন্ হী মে দে দি য়া চ লো • দর

| ম ম ম | ম ম ম ম | প :ধণধ পম ম | প মপ ।

জী কে পা স্ যা কে ও পহে লে পি না ই য়ে ও

| প ম গ রস | স স স স | প :ধ | ণ ধ প | |

গোল্ মাল হ্যায় ভাই সব্ গোল্ মাল্ হ্যায় • গোল মা ল্ গোল্ • মাল্ হ্যায়

Back to Song (A)

Song (D)

| | প :ম ম গ | গ :গ গ গম | গর :গ ম গ | গ |

বিন্ সি লি কা মি জ্ কে তো কুছ্ না হি লি য়া

| পপ ম গ গ | গ :গ গ গম | গর গ মগ গ | গ ম |

সিলি হ খ্রি কা মি জ কে সি লা ই চা হি য়ে সি

| ম ম ম ম | ম :ম ম ম | প :ধণধ :পম ম | প |

লা ই সে মে কে লি য়ে ফির পয় সা চা হি য়ে •

| প পম মগ :গ | গ :গ গ গম | গর গ মগ গ | গ মপ |

পয় সা কামা নে কে লি য়ে ফির পয় সা চা হি য়ে ও

| প ম গ রস | স স স স | প :ধ | ণ ধ প |

গোল্ মাল্ হ্যায় ভাই সব গোল্ মাল্ হ্যায় গোল্ মা ল্ গো ল্ মাল্ হ্যায়

Back to Song (A and Fade out.

অমিয়র চশমা

(৫৪ পৃষ্ঠার পর)

কিপার চলে গেছে। সমস্ত মাল আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। দারোয়ানকে অনেক বলে কয়ে মালগুলো রাখার একটা ব্যবস্থা করল অমিয়, সকালে এসে চালান টালান সই করিয়ে নিলেই চলবে। সেই রাত্রেই ষ্টোর ভেঙ্গে কয়েক লক্ষ টাকার মাল চুরি হয়ে গেল। অমিয়ও বাদ পড়ল না। অনেক ঘোরাঘুরি করেছিল লাভ হয়নি। কোন প্রমাণই দাখিল করতে পারেনি অমিয়।

কি রকম একটা অবসন্নতাবোধ, একটা ক্লান্তি সমস্ত শরীর মনকে ঘিরে ধরেছে অমিয়র। ভ্রূদুটো নীচের দিকে ঝুলে পড়ছে। কাল থেকে সেই চশমাটা ওকে আবার পরতে হবে, যেটার একটা ডাঁটি নড়বড় করছে, রঙটা বিবর্ণ হয়ে গেছে, যেটা পড়লে ওর চেহারাটা ভীষণ করুণাপ্রদ হয়ে ওঠে—সেই চশমাটা আবার কাল থেকে পরতে হবে অমিয়কে। অমিয়র যেন মনে হচ্ছে ও কতদিন ধরে হাঁটছে অথচ বারবার ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় ফিরে আসছে। ওকে যেন কেউ বিরাট একটা দুর্গের 'ভুলভুলাই'এর মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে, যতবারই ও পথ খুঁজে খুঁজে বেরোতে চাইছে ততবারই ফিরে ফিরে সেই একই জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে। অথচ অমিয় জানে বেরোবার একটা পথ কোথাও আছে কেন যে ও সেটা বারবার হারিয়ে ফেলছে বুঝতে পারে না।

সাত মিনিট

(৪৬ পৃষ্ঠার পর)

ক্রিমস্ট সম্বন্ধে ফিল যা বলেছিলো ব্যারেট, জেলকিনকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলে।

তারপর ডানকান এখন কাউকে চটাতে চায় না। পাককা সুবিধেবাদি লোক। উইলার্ড ওসবোর্ণের মতো লোকের বিরুদ্ধে সে একেবারেই যাবে না, যে ডানকানের সঙ্গে তোমার ব্যাপার-স্যাপারের খবর যখন তার জানা, ডান-কান তোমার কথা রাখবে।

তারপর চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে একটু আক্ষেপ করলো :

এই মামলাটা দিয়ে ব্যারেট এ্যাণ্ড জেলকিন পার্টনারশিপ শুরু হতে পারলে দারুণ হোতো। ভেবে দেখো কী প্রচার হোতো আমাদের—চ্যালেঞ্জ করার মতো মামলা, স্বাভাবিক প্রচার। যাক, পরে আরো মামলা আসবে। যাক, ওসবোর্ণের মেয়ের সঙ্গে তোমার ব্যাপারটা কীভাবে হোলো, বলো তো একটু।

ব্যারেট ওসবোর্ণ কাহিনী বলতে লাগলো।

চোদ্দটা রেডিও স্টেশন ও টি ভি স্টেশনের মালিক উইলার্ড ওসবোর্ণ ট্যাকস সংক্রান্ত একটি গোলমালে পড়ে-ছিলেন। ব্যারেট যেখানে কাজ করতো সেই ফার্ম ব্যারেটের হাতে কাজটা তুলে দেয়, এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাটের সেই মামলা থেকে ওসবোর্ণকে বের করে নিয়ে আসে। যদিও, ওর ফার্ম এই ব্যাপারে সমস্ত কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু ওসবোর্ণ লোক লাগিয়ে ব্যারেটকে খুঁজে বের করে কৃতজ্ঞতা জানান। ব্যারেটের সূক্ষ্ম কাজের নমুনা তাঁকে অবাক করে দেয়।

এইখানেই ব্যারেটের সঙ্গে ফের আলাপ হয়।

হিম-ধোঁয়া মুখ মেয়েটির বয়েস গোটা আটাশ।

গ্রীসিয়ান, নিখুঁত চেহারা।

অনেকখানি খোলা জামার ফাঁকে ভরন্ত বুকের বাঁক। দীঘল পা।

এবং, পেকে যাওয়া!

ফে'র সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হতে বেশি দেরি লাগেনি। একদিন তার বাসাতেও নিয়ে গেলো।

ফে অভিমান করে বললো, এখানে? আমাকে আগে নিয়ে আসো নি কেন?

আনি নি। মানে—লজ্জায়—

লজ্জায়? কেন?

তোমরা এতো বড়োলোক।

আমি যদি সপগার্ল কিংবা সেক্রেটারি হতাম?

প্রথম সাক্ষাতেই তোমায় কাপড় খুলে দিতাম!

অসভ্য!

ব্যারেটের উরুর ওপর ফে'র হাত বিলি কাটতে লাগলো।

ফিস ফিস করে বললো :

তাই করো তাহলে!

(চলবে)

অলীক রেখা

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

না, অসুখ থাকবে না, সেদিন আমাদের দেখা হবে।

রেখা বলল—ততদিন তোমাকে না দেখে কি করে থাকব? কতদিন আমরা এই আশায় অপেক্ষা করে থাকব?

তা জানি না। তবে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

অপেক্ষা করতে রাজি আছি। কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে আমরা যদি বুড়ো হয়ে যাই—তখন?

আমি রেখার মুখের দিকে তাকালাম। বললাম—মোম নিবিয়ে আমরা চুপ করে বসে থাকব?

রেখা রাজি হল। আমি মোম নিবিয়ে দিলাম। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। এবার? আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। জানলা খোলা! খোলা জানালা দিয়ে আমরা একসঙ্গে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আকাশ দেখতে লাগলাম। আকাশের ক্রমশ সমস্ত তারার আলো নিবে যাচ্ছে। শেষ চৈত্রের ছেঁড়া মেঘ আকাশে আকাশে ভাসতে ভাসতে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার বিচিত্র শব্দ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু রেখার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বাতাস দপ করে বন্ধ হয়ে গেল. তারপর সমস্ত জ্বলন্ত আকাশ কালো হয়ে গেল। ঝুপ করে প্রথমে আস্তে, তারপর আর একটু জোরে, তার-প্রবল বেগে অকালে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। বৃষ্টিতে কোন মানুষ দেখা গেল না। বৃষ্টির সঙ্গে তুমুল ঝোড়ো শীতের বাতাস। বৃষ্টিতে আমাদের মুখ ভিজে গেল। আমার ঘর ভিজে গেল। আমার বিছানা ভিজে গেল। তবু আমরা তুমুল বৃষ্টি দেখতে লাগলাম। মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলাম না। তুমুল বৃষ্টি ছাড়া আমরা আর কিছু দেখতে পেলাম না। বৃষ্টি দেখে মনে হল—কয়েক হাজার বছর পর এই বৃষ্টি থামবে। আমরা হাজার বছরের বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শহরের রাস্তায় নামলাম। রেখাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারব তো?


অনুপম আয়ুর্ব্বেদীয়
কেশ তৈল
সাধনা
আমলা
অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
যুগ যুগ ধরে সুবিদিত
আমলকিই
ইহার প্রধান
উপকরণ
সাধনা
আমলা
কেশ পতন, অকালপক্কতা ও
কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং
প্রচুর সজীব, সুন্দর, ঘনকৃষ্ণ
কেশোদ্গমে সহায়তা করে।
মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

Regd. No. WB/EC 9 GHAROA : Bengali Weekly 16th Nov. 79' Rs. 1·50